خليفة اللّٰه
المهدي

Caliph of Allah
Al-Mahdi

খলীফাতুল্লাহ
আল-মাহদি

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

بسم الله الرحمن الرحيم

সকল প্রশংসা الله সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য যিনি সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা। মুহাম্মাদ (সা:) -এর দুরুদ এবং তার পরিবার ও সকল সাহাবীদের উপর রহমত নাযিল হবে।

রাসূলুল্লাহ (সা:) যখন মক্কা থেকে সর্বশেষ নবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন, তখন মক্কার লোকেরা ও সমগ্র আরব তার বিরোধিতা করে (প্রায়)। তাদের মতে, আমাদের মধ্য থেকে আমাদেরই একজন কি করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার রাসূল হয়; যে কিনা আমাদের মতই খানা খায়, বাজারে যায়। তার সাথে কেন ফেরেশতা চলাচল করে না বা তার তো অনেক সম্পদও নেই। এদের মধ্যে অনেক মানুষ-ই শেষ পর্যন্ত ইসলাম থেকে বঞ্চিত হয়ে দুনিয়া থেকে চলে যায়।

ইমাম মাহদি সম্পর্কেও হয়তো মানুষের ধারণা যে, তিনি একজন অতিমানব হবেন। তিনি কা'বা প্রাঙ্গণে রুকনে ইয়ামানি ও মাক্বামে ইবরাহীমের সামনে লোকদের নিকট থেকে বায়'আত গ্রহণ করবেন এবং সৌদি প্রশাসনকে আল্লাহ তা'আলা বাধা প্রদান থেকে বিরত রাখবেন বা ধ্বংস করে দিবেন। তিনি নিজের মাহদিয়্যাত সম্পর্কে নিজেই জানবেন না, বরং কিছু লোক তাকে তার ইচ্ছার

বিরুদ্ধে ঘর থেকে বের করে নিয়ে এসে জোরপূর্বক বায়আত প্রদান করবে।

হাদিসের ভুল ব্যাখ্যা, সেই ভুল ব্যাখ্যার ব্যাপক প্রচার এবং আলেম সমাজের এই ব্যাপারে গবেষণার অভাবের ফলস্বরূপ সাধারণভাবে হয়তো সকল মুসলিমদের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে।

قال إنك لن تستطيع معي صبرا

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا

আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্যধারণ করে থাকতে পারবেন না। (৬৭)

যে বিষয়ে আপনার কোন খবর নেই, তাতে আপনি কিভাবে ধৈর্য ধারণ করবেন। (৬৮)

[سورة الكهف]

ঠিক আছে, সামনে অগ্রসর হোন .....

হাদীস পর্যালোচনা

يكون اختلاف عند موت خليفة - فيخرج رجل من اهل المدينة هارب الى مكة - فياتيه الناس من اهل مكة - فتخرجونه - وهو كاره - فيبايعونه بين الركن والمقام - ويبعث اليه بعث من اهل الشام فيخسف بهم بالبيداء بين مكة والمدينة - فاذا راى الناس ذلك اتاه ابدال الشام وعصائب من اهل العراق - فيبايعونه بين الركن والمقام

সুনান আবু দাঊদ :- ৪২৮৬

একজন বাদশাহ-র মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে মতানৈক্য দেখা দিবে। তারপর শহরবাসি এক ব্যক্তি প্রকাশ পাবে, যে পালিয়ে মক্কায় যাবে। তারপর মক্কার কিছু লোক তার নিকটে আসবে। তারপর তাকে প্রকাশ করা হবে এবং তিনি অপছন্দ করবেন। তারপর রোকন ও মাকামের মাঝে বায়আত গ্রহণ করবে। এবং শাম থেকে একটি বাহিনী তার দিকে পাঠানো হবে। মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী এক খোলা ময়দানে তাদেরকে জমিনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। মানুষ যখন এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করবে, শাম থেকে আবদালরা ও ইরাক থেকে দলে দলে লোক তার নিকটে আসবে। তারপর তার হাতে রোকন ও মাকামের মাঝে বায়আত গ্রহণ করবে।

এখানে পর্যায়ক্রমিক ঘটনাসমূহ হলো:

১. একজন বাদশাহ-র মৃত্যুর নিকটবর্তী সময়ে তিনজন রাজপুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব।
২০১৫ সালে বাদশাহ আব্দুল্লাহ-র মৃত্যু এবং সেবছরই তিন রাজপুত্র মুকরিন বিন আব্দুল আজিজ, মুহাম্মাদ বিন নাইফ ও মুহাম্মাদ বিন সালমান-এর মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

২. মদিনার অধিবাসী একব্যক্তির মক্কায় পালিয়ে আসা।
মদিনা বলতে এখানে মদিনা মুনাওয়ারা হয়ত বুঝানো হয়নি। বরং শহর বুঝানো হতে পারে। কুরআনে ১৪টি আয়াত এমন আছে যেখানে 'মদিনা' শব্দটি এসেছে, যার মধ্যে কেবলমাত্র তিন জায়গায় (তওবা-১০১, ১২০ ও মুনাফিকুন-৮) মদিনা মুনাওয়ারা হিসেবে ও বাকি ১১ জায়গায় (কাহাফ-১৯, ৮২, ক্বাসাস-১৫, ১৮, ২০, আ'রাফ-১২৩, আহযাব-৬০,

হিজর – ৮৭, ইয়াসিন – ২০, ইউসুফ – ৩০, নামল – ৪৮) শহর হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া অন্যান্য বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ইমাম মাহদি মদিনার পূর্ব দিকের কোনো দেশ থেকে আসবেন। মদিনার পূর্বদিকে সোজা রেখা টানলে সেটা বাংলাদেশ পর্যন্ত আসে। পূর্বদিকে হিন্দুস্তান ও পাকিস্তান থাকলেও সংখ্যাতাত্ত্বিক মানের দিক থেকে মদিনার সাথে শুধু বাংলাদেশের মানেরই মিল পাওয়া যায়। নিচে দেখা যাক,

باكستان — 21 — 3
الهند — 18 — 9
المدينة — 4
بنجلاديش — 4

৩. রোকন ও মাকামের মাঝে লোকেরা বায়আত গ্রহণ করবে (১ম বায়আত)।

রোকন ও মাকামের প্রচলিত অর্থ ধরা হয় যথাক্রমে হাজরে আসওয়াদ ও মাকামে ইবরাহীম, যা সম্পূর্ণ সঠিক কিনা বলা যায় না। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আরবি ركن শব্দটির স্বাভাবিক অর্থ হলো Corner/কোণ (noun form)। কিন্তু এর অন্য একটি অর্থ হলো Shunt/সরে যাওয়া (verb form)।

الركن — 1+30+200+20+50 — 301 — 3+0+1 — 4

৪. বাইদা বলতে এখানে পাহাড়ি এলাকাকে বুঝানো হয়েছে।

৫. আরবি مقام শব্দটির স্বাভাবিক অর্থ আসে status. এর একটি synonym হলো وضع যার অর্থ position. এর আরেকটি synonym হলো مكانة বা rank. এর আরেকটি synonym হলো مرتبة বা grade, degree. বাংলায় শ্রেণী, মান, পদমর্যাদা, মাত্রা ইত্যাদি।

المقام — 1+30+40+100+1+40 — 212 — 2+1+2 — 5

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي يصلحه الله تعالى في ليلة واحدة - ١٠٥٣

রাসূল (সা.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা মাহদিকে এক রাতে পরিশুদ্ধ করে দিবেন। [আল ফিতান, হাদিস - ১০৫৩]

قَالَ أَلَمْ أَقُل إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

আমি কি আপনাকে বলিনি যে, আপনি আমার সাথে কিছুতেই ধৈর্য ধরতে পারবেন না। (৭২) [سورة الكهف]

يقتتل عنز كنز كم ثلاثة - كلهم
ابن خليفة — ثم لا يصير الى واحد
منهم — ثم تطلع الرايات السود من
قبل المشرق — فيقتلو نكم قتلا
لم يقتله قوم — ثم ذكر شيء لا
احفظه — فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ
وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلْجِ — فَإِنَّهُ
خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ

সুনান ইবন মাজাহ, হাদীস নং : ৪২৩৫

তোমাদের ধনভান্ডারের নিকট তিনজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হবে। এদের প্রত্যেকেই রাজপুত্র। তাদের কেউ সেই ধনভান্ডার হাসিল করতে পারবে না। তারপর পূর্ব দিক থেকে কালো ব্যানারের উদয় হবে। তারা তোমাদেরকে এমনভাবে হত্যা করবে, এরপূর্বে এরকম হত্যাকান্ড আর কোনো জাতি করেনি। সাওবান (রাঃ) বলেন, এরপর কিছু একটা বললেন যা আমি স্মরণে রাখতে পারিনি। তারপর নবীজী (সাঃ) বললেন, সুতরাং, যখন তোমরা তাকে দেখবে তার হাতে বায়আত হয়ে যেও, বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও। সুতরাং, নিশ্চয়ই সে আল্লাহ-র খলিফা আল মাহদি।

এই হাদীসের ঘটনাপ্রবাহ :

১. সৌদি তিন রাজপুত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং এদের কেউই শেষ পর্যন্ত বাদশাহ হতে পারবে না।

ইতিমধ্যে মুকরিন বিন আব্দুল আজিজ মারা গিয়েছে বা মেরে ফেলা হয়েছে। মুহাম্মাদ বিন নাইফকে জেলে বন্দি করে রাখা হয়েছে। মুহাম্মাদ বিন সালমানও শেষ পর্যন্ত বাদশাহ হতে পারবে না। {ইনশাআল্লাহ}

২. পূর্বদিক থেকে কালো ব্যানারের উদয়

হাদীসে ব্যবহৃত আরবি শব্দ رايات অর্থ ব্যানার। কিন্তু এর অন্য একটি অর্থ হলো علم / Science. পূর্ব দিক থেকে কালো বিজ্ঞান-এর ব্যবহার শুরু হবে যার মূল উদ্দেশ্যই হলো মানুষকে মেরে ফেলা। উদাহরণস্বরূপ "COVID 19" এবং "HAARP" তথা High-frequency Active Auroral Research Program -এর কথা উল্লেখ করা যায়। একটি হলো ভাইরাস এবং আরেকটি হলো Weather Weapon বা আবহাওয়া অস্ত্র।

THE

MACHINE

DISCLOSURE

উহান

COVID-19

Coronavirus Disease 2019

Biological Weapon

৩. এমনভাবে মানুষদেরকে হত্যা করা হবে, যা ইতিপূর্বে আর কেউ করেনি।
করোনা ভাইরাসের মাধ্যমে দুনিয়াব্যাপি মানুষদেরকে ধোঁকা দিয়ে রোগ ছড়িয়ে দিয়ে এমনভাবে মেরে ফেলা হয়েছে, যা সম্ভবত এর আগে কখনো পৃথিবীতে ঘটেনি।

৪. বরফের উপর হামাগুড়ি দিয়ে হলেও বায়আতবদ্ধ হতে হবে।
সম্ভবত ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশের সময় স্বাভাবিকভাবে মক্কায় প্রবেশ করা যাবে না। করোনা ভাইরাসের উসিলা দিয়ে সৌদি সরকার সারা দুনিয়া থেকে হাজীদেরকে হজ্ব-ওমরা করার জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে দেয়নি। এর মূল উদ্দেশ্য হতে পারে, লোকেরা যেনো ইমাম মাহদির হাতে বায়আত হওয়ার জন্য মাসজিদুল হারামে বা মক্কায় একত্রিত হতে না পারে।

উল্লেখ্য, গত ২০১৭ সালে সৌদির ক্রাউন প্রিন্স মুহাম্মাদ বিন সালমান ক্ষমতা গ্রহণ করে। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে যে-ই তার দেশ পরিচালনা করার ভুল পদ্ধতি এবং মুসলিমদের পবিত্রভূমি আরবকে ধর্মনিরপেক্ষ কুফরি রাষ্ট্রে পরিণত করার বিষয়ে কথা বলেছেন, তার উপরেই নেমে এসেছে অবর্ণনীয় নির্যাতন। বিশেষ করে সচেতন আলেম সমাজ, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ এবং সাইবার অ্যাক্টিভিস্টদের ব্যাপক হারে গ্রেফতার, নির্যাতন, এমনকি খুন

পর্যন্ত করা হয়েছে। ২০২০ সালের আগস্ট মাসে ক্বারী বাসফারকে আটক করা হয়েছে। ক্বারী বাসফার জেদ্দার কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীআ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এবং ওয়ার্ল্ড বুক অ্যান্ড সুন্নাহ সংস্থার প্রাক্তন সেক্রেটারি জেনারেল। ২০১৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কোনো কারণ ছাড়াই গ্রেফতার করা হয় শাইখ নায়েফ আল সাহাফিকে। তারপর তাকে ১০ বছরের কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। বার্তা সংস্থা ডকুমেন্টিং অপ্রেশন এগেইন্সট মুসলিম (DOAM) জানিয়েছে, সৌদি অপরাধমূলক আদালত গোপনে এই রায় প্রদান করে। এ রায় সম্পর্কে আদালত কিছুই জানায়নি। রাষ্ট্রবিরোধী বিভিন্ন কর্মকান্ডে জড়িত থাকার মিথ্যা অভিযোগে শাইখ সালমান আল আওদাকে সৌদি সরকার ২০১৭ সালের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে দীর্ঘ চার বছর ধরে কারাগারের কনডেম সেলে বন্দি করে রেখেছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন অব মুসলিম স্কলার্সের সহকারী মহাসচিব শাইখ সালমান আল আওদা কারাগারে হারিয়েছেন নিজের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি। শাইখ সালমান আল আওদার ছেলে আব্দুল্লাহ আল আওদা সংবাদ মাধ্যমকে জানান, "বাবা জেলে যাওয়ার আগে চোখে দেখতে পেতেন এবং কানে শুনতেন। জেলে থাকা অবস্থায় বাবার উপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়েছে। সৌদি সরকারের নির্দেশে তার ওপর নির্যাতন চালানোর কারণে অন্ধ ও বধির হয়ে গেছেন।" এছাড়াও, সৌদি আরবের সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল দুজন বিচারককে বরখাস্ত করেছে তারা দাড়ি কামাতে ও ধূমপান করতে নিষেধ করেছেন বলে।

তিনি কে?

ARE YOU READY?

LET'S
GO
SHOOTING

Imam Mahdi

Mushtaq Muhammad Arman Khan ibn Abdul Quddus Khan.

He came from a noble family at Netrokona Bangladesh. His birth date is 30th May 1981. He was very keen on cultural activities, had an alacrity towards poetry. During his school life, he used to act and sing. He had an impromptu poetry acumen. Yet, he was a topper in his class. After his accomplishment of School and College life, he got into BUET and studied EEE. Much like other meritorious peers, he went to that Campus with Sky-high aspiration for Dunya. But, a single night's dream changed the momentum of his life. By the grace of Almighty Allah, he had chance to participate in a world gathering of Tablique jama'at at Tongi, Bangladesh. He was a 3rd year student that time. But, it was a turning point of his life that changed his life style, ideology, spirits dramatically.

He chose Islam as a perfect way of lifestyle and started to love it. He had chosen a candid, austere lifestyle and became meticulous to acquire Islamic knowledge. However, he continued his engineering career, too. He went to Malaysia for higher education after accomplishment of his graduation with first class. He worked for Malaysian communication of Multimedia Commission and DG Telecommunication as a successful researcher and scientist. He was the first man who worked with off-net Modeler. His scientific journal was published from different countries of the world. He is also author of the book "MIMO technology"

which was published from Europe. Though he is a successful researcher, Author, scientist and teacher he is devoid of the avarice of Dunya. He abandoned the covetous offer of bright career from the USA, Netherlands, Scotland, Australia. He came back to Bangladesh and worked as a Faculty of a Private University. In his conjugal life, he has three sons and one daughter namely Abdullah, Qaseem, Ibrahim & Fatima. Though he studied in english medium but sent his children to Madrasah so that they can work for the Deen.

He has immense alacrity towards learning ilm though he has myriad of obligations. He has intimate relations with Islamic scholars. He has studied kitabs of Madrasah syllabus and maintained a regular association with Islamic scholars. Renowned scholars accolade his recitation of QURAN and ilm. He has sacrificed his life for Islam. He has taken self-retirement from his professional career. Now, he is quite busy with

preaching efforts at home and abroad. During his religious preaching tour in 2016 A.D in Uganda for four months, he as well as his companions were in four districts of the country named Wakiso, Kalangala, Masaka and finally the capital Kampala. About 600 non-believers including men and women embraced Islam reciting the holy Shahadah. His another identity is that he is an Ahlul Bait (descendants of our messenger (SA)). The writer possesses a great piety. He often dreams of rasulullah & more noticeably, ALLAH (SWT). Having inkling from Rasulullah (SA) through his dream, he and some of his companions have migrated to Mecca & now staying there searching for Imam Mahdi. As they dreamt his advent is close.

ইমাম মাহদি

মুশতাক মুহাম্মাদ আরমান খান। জন্ম তারিখ ২৭ রজব ১৪০১ হিজরী (৩০ মে ১৯৮১ ইসায়ী)। গ্রামের বাড়ি নেত্রকোনা। বাসা টঙ্গী, গাজীপুরে। স্কুল ও কলেজে লেখাপড়া করেন। তারপর বুয়েটে EEE নিয়ে লেখাপড়া করেন। মাস্টার্স করেন মালয়েশিয়াতে। একসময় দেশে ফিরে এসে একটি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে প্রায় ছয় বছর শিক্ষকতা করেন। পিতার নাম আব্দুল কুদ্দুস। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ৪ সন্তানের জনক। একসময় তিনি মক্কায় চলে যান। কিছুদিন পর তার পরিবারও মক্কায় তার কাছে চলে যায়। বর্তমানে তিনি মক্কাতেই বসবাস করছেন।

দৈহিক গঠন : ফর্সা, তবে আরবদের মত অতোটা ফর্সা নন। দেহ মধ্যম গড়নের, সুঠাম, খুব মোটাও নয় আবার একদম শুকনোও নয়। খুব লম্বাও নয় আবার বেঁটেও নয়। প্রশস্ত ললাট, নাসিকা উঁচু। চোখের পাতি ও ভ্রূ কালো। লম্বা, ঘন দাড়ি যা বুক ঢেকে ফেলে। উপরের পাটিতে মাঝের দুটি দাঁত নেই। বাইক-এক্সিডেন্ট-এ দুটি দাঁত হারান। মুখে বেশ কয়েকটি তিলক রয়েছে। কপালে সিজদার চিহ্ন; দেখতে অনেকটা খুরের মত। হযরতের পিঠে মোহরে নবুওয়াতের মত চিহ্ন বিদ্যমান। কথা স্পষ্ট, ধীর গতিসম্পন্ন, ভারী মনে হয়।

বংশ পরিচয় : হযরত মুয়াবিয়া (রা:)-এর পর খিলাফত চলে যায় ইয়াজিদের নিকট। তার শাসনামলে হযরত হুসাইন (রা:) তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। কিন্তু, তার বাহিনীকে প্রতারণার মাধ্যমে কারবালায় নিয়ে যেয়ে হত্যা করা হয়। সেই দিন হুসাইন সহ বাহাত্তর জন আহলে বাইত পুরুষকে দুশমনরা হত্যা করে। তাদের মাথা কেটে বর্শায় ঢুকিয়ে কারবালার প্রান্তরে টানিয়ে দেয়। আর তাদের দেহগুলোর উপর ঘোড়া চালিয়ে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়া হয়। আহলে বাইতের মহিলাদের বন্দী করে হুসাইন (রা:)-এর মাথাসহ দুশমনরা ইয়াজিদের দরবারে নিয়ে যায়। ইয়াজিদ নবী পরিবারের সদস্যদের মিশরের কায়রোতে পাঠিয়ে দেয়। তারপর থেকে নবী পরিবারের লোকেরা কিছুকাল সেখানেই অবস্থান করেন। তবে ফাতিমা (রা:)-এর মাধ্যমে নবীজী-র পরিবার যে বিস্তৃতি লাভ করে সেটা হয়তো ইতিহাসের পাতায় হারিয়ে যায়। হতে পারে আজ প্রায় চৌদ্দ শত বছর পর তাদের খুঁজে পাওয়া দু:সাধ্য ব্যাপার, কিন্তু তারা এখনো

আছেন। আমরা মুসলিমরা তাদের কথা ভুলে গেলেও ইহুদি-নাসারাদের দল আরব ভূ-খন্ডে তন্ন তন্ন করে তাদেরকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যেহেতু নবীজীর বংশ থেকে ইমাম মাহদির জন্ম হবে। তিনি মুসলিমদের হারানো খিলাফত আল্লাহ'র ইচ্ছায় আবার প্রতিষ্ঠা করবেন। বর্তমান সময়ে নবীর বংশধরদের উপর ভিত্তি করে ইমাম মাহদিকে চেনা হয়তো অনেক কঠিন। নবীর বংশধরগণ সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছেন। তাদের অনেকেই হয়তো জানেন না যে তারা নবীর বংশধর। বিশেষ করে যারা আরবের বাহিরে অবস্থান করছেন তাদের জন্যে জানা আরো কঠিন। আবার কে হাসান (রা:)-এর বংশধর আর কে হুসাইন (রা:)-এর বংশধর তা জানা আরো কঠিন। বর্তমানে মানুষ তাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে বিস্তারিত খবর হয়তো রাখেন না। তাই কাউকে যদি আল্লাহ তা'আলা স্বপ্নের মাধ্যমে জানান, সম্ভবত তাহলেই কেবল জানা সম্ভব কে রাসূলুল্লাহ-র বংশধর। আরসালান খানের ভাষ্য অনুযায়ী তিনি আহলে বাইত। শাইখকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বপ্নের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়েছে যে তিনি আহলে বাইত। স্বপ্নে তিনি খাদিজা (রা:), ফাতিমা (রা:)-কে দেখেছেন, যা তিনি গায়রে মাহরাম হলে হয়তো দেখার কথা না। এছাড়াও হযরতের পূর্বপুরুষগণ (বার পুরুষ পূর্বে) ইরান হতে হিন্দুস্তানে এসেছেন। ইরানে রাসূলুল্লাহ-এর বংশধরদের একটি বড় অংশ এখনও রয়েছে। Wikipedia-এর তথ্যমতে বর্তমানে ইরানে ষাট লক্ষেরও অধিক মানুষ নবীর বংশধর।

সূত্র : https://en.wikipedia.org/wiki/Sayyid#Iran
http://isamahdi.com/content/intro.html

আল্লাহ'র রাসূলের বংশধরগণ ইরানে আগমন করেছিলেন ১৫শ থেকে ১৭শ শতাব্দীতে। পরবর্তীতে অনেকেই হিন্দুস্তানে চলে আসেন। বর্তমানে হিন্দুস্তানের ভারতেই প্রায় ৭০,১৭,০০০ জন আহলে বাইত রয়েছেন।

সূত্র : https://en.wikipedia.org/wiki/Sayyid#India

সুতরাং হযরতের পূর্বপুরুষগণ ইরানের হওয়াটাও একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে যে, হয়তো তিনি আহলে বাইত।

ঠিক আছে, আসুন অগ্রসর হোন...

আমীরের সতর্কবাণী : রক্তের বন্যা আসন্ন

ইমাম মাহদির চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

দাওয়াত ও তাবলীগের উভয় পক্ষের সকল সাথীদের প্রতি
বান্দা মুহাম্মাদ।

সালামুন আলাইকুম।

আল্লাহ পাক এমন সত্বা যিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী
নন। তিনি সমস্ত কাজে আপন ইচ্ছা ও কুদরতের দ্বারা
সম্পন্ন করেন এবং তিনি যেটা করেন সেটাই সবচেয়ে উত্তম
ও সঠিক। তিনি আপন হাবীব (সাঃ) কে আমাদের জন্য
রহমত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন, যিনি তার দায়িত্ব
সঠিকভাবে পূরণ করে আল্লাহ পাকের দরবারে ফিরে
গিয়েছেন। আল্লাহ পাক তাকে তার উপযুক্ত বদলা
দান করুন। সকল ফেরেশতা ও মুমিন বান্দার পক্ষ
থেকে তার জন্য দরুদ ও সালাম পৌঁছে দিন। আম্মা বা'দ।

আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান, আমার দেয়া নিয়ামতের
শুকুর গুজারি করো, তাহলে আমি তোমাদের জন্য
নিয়ামতকে আরো বৃদ্ধি করে দিবো, আর যদি তোমরা
নাশুকরি করো, জেনে রেখো আমার আযাব বড়
শক্ত। তাবলিগের মেহনত ছিল আমাদের জন্য অনেক
বড় এক নেয়ামত। কিন্তু আমরা এর কদর করিনি
বিধায় আল্লাহ পাক এই মেহনতকে উঠিয়ে নিয়েছেন।
দ্বীনের মেহনত উঠিয়ে নেওয়া অনেক বড় এক আযাব যা

ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড় বা এরকম অন্য কোনো আযাব থেকেও শক্ত। বর্তমানে তাবলিগের যে পরিণতি হয়েছে তা আল্লাহ পাকের ফয়সালাতেই হয়েছে, কারণ আল্লাহ পাকের ফয়সালা ব্যতীত তো কিছুই হয় না।

আমাদের জন্য জরুরি হলো, আমরা এই ব্যাপারে তালাশ করে দেখি, কেনো আল্লাহ পাক আমাদের উপর এতো নারাজ হলেন যে তিনি দুনিয়া ব্যাপি তাবলিগের এতো মকবুল এক মেহনতকে বর্তমান হালতে এনে দাড় করালেন? এই মেহনত নষ্ট হওয়ার কারণ কখনোই বিবাদমান মতানৈক্য যা মাওলানা সা'দ সাহেব ও আলেম সমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছে, তা নয়। আলেম সমাজ বা ষড়যন্ত্রকারী চক্র যারাই এই ঘটনার সাথে জড়িত ছিল, এরা তো কেবল আসবাব মাত্র, যা আল্লাহ পাকের ফয়সালাকে উজুদে আনতে ব্যবহৃত হয়েছে।

কোনো ষড়যন্ত্রকারী বা অপশক্তির কোনো পরিকল্পনাই
কোনো কাজে আসতো না যদি আল্লাহ পাক
এর বিপরীতে কোনো পরিকল্পনা করতেন। কেননা,
আল্লাহ পাক উত্তম পরিকল্পনাকারী এবং তিনি যা
ইচ্ছা তাই করার সামর্থ্য রাখেন। উহুদের যুদ্ধে
৭০ জন সাহাবী (রাঃ) শহিদ হওয়ার পিছনে
দৃশ্যমান কারণ মনে হয় যেনো ওই সকল তীরন্দাজ
সাহাবীর স্থান ত্যাগ করা যাদেরকে নবীজী (সাঃ)
স্থান ত্যাগ করতে নিষেধ করেছিলেন। আসলে তো
কারণ এটা ছিলো না। বরং বদরের যুদ্ধের ৭০
জন কাফের বন্দীদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে
দেয়ার পরই তো আল্লাহ পাক সমসংখ্যক সাহাবীর
শাহাদাতের ফয়সালা করেছিলেন। আর আল্লাহ
পাকের এই ফয়সালা উযুদে আসার জন্য তীরন্দাজ
সাহাবায়ে কেরামের একটি ভুল পদক্ষেপ আসবাব
হিসেবে জাহের হয়েছে। ঠিক তেমনি তাবলিগের
মেহনতের বর্তমান পরিণতি হলো আল্লাহ পাকের
ফয়সালা এবং তা উযুদে আসার জন্য আলেমসমাজ
ও ষড়যন্ত্রকারীরা ছিল আসবাব। তাহলে এই
মেহনতের বর্তমান পরিস্থিতির পেছনে আসল কারণ
হলো আল্লাহ পাকের নারাজি। আর এই
নারাজির কারণ হলো আমভাবে আমরা সকল সাথি
এই মেহনতের সাথে খেয়ানত করেছি। একেবারে
মারকাজ থেকে শুরু করে পয়েন্ট, হালকা ও
মাসজিদওয়ার সাথিদের মাঝে দলাদলি, খাওয়াসদের

সর্বক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি; মারকাজের, পয়েন্টের, জেলার, এমনকি হালকার মাশোয়ারায় ঝগড়াঝাটি ও হাতাহাতি, কোথাও নির্দিষ্ট কোনো আমির না থাকায় কেউ কাউকে মান্য করে না, সবাই আমির সাব, ইস্তেন্নায়ি মালের খেয়ানত, জামাতের রোখ ও বিদেশীর জামাতের ব্যাপারে লবিং, মেহমানদারির নামে ২০-২৫ পদের তরকারি দ্বারা ভোজের আয়োজন ইত্যাদি নানাবিধ খেয়ানতের কারণে আল্লাহ পাক নারাজ হয়েছেন। এ কারণগুলোর কোনোটাই নবীজী (সাঃ) - এর সুন্নত নয় বা খুলাফায়ে রাশেদিনেরও সুন্নত নয়।

হযরত আলী (রাঃ) ও হযরত মুয়াবিয়া (রাঃ) - র মাঝে যে দ্বন্দ্ব হয়েছিল তার পরিণতি ছিল খুলাফায়ে রাশেদিনের বরকতময় জামানার পরিসমাপ্তি, যদিও এই দ্বন্দ্বের উভয় দিকে জান্নাতি নেতা ছিলেন এবং এই দ্বন্দ্ব তখন শেষ হয় যখন হযরত হাসান (রাঃ) স্বেচ্ছায় খেলাফত মুয়াবিয়া (রাঃ) - র

হাতে হস্তান্তর করেন। তাবলিগের বর্তমান বিবাদের দুই পক্ষের কাছেকেই আমরা জান্নাতি হওয়ার নিশ্চয়তা দিতে পারি না এবং এর পরিণতি তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। প্রায় সকল মসজিদ থেকে পাঁচ কাম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে, ময়দানে খুনাখুনি হচ্ছে, পূর্বের সংখ্যার ন্যায় জামাত আল্লাহর রাস্তায় বের হচ্ছে না। মাওলানা সা'দ সাহেব এবং উলামায়ে কেরামের মাঝে বনাবনি হচ্ছে না, তারা এক হতে পারছেন না। কারণ, এর পেছনে বড় এক ষড়যন্ত্র ও টাকাপয়সার চালাচালি আছে, যা মারকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক সাথীই অবগত আছেন। এর মানে হলো বর্তমান বিবাদ আর কখনো মিটবে না। তাহলে এখন আমাদের জন্য করণীয় কি এবং সবকিছুর পরিণতি আসলে কোন দিকে যাচ্ছে?

নবীরা যখন কোনো এলাকায় আসতেন মেহনত করতেন, লোকেরা সেই মেহনতের বিরোধিতা করতো এবং একসময় আল্লাহ পাক তার নবীকে সরিয়ে নিতেন ও আযাব পাঠাতেন। হিন্দুস্তানের পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) দুইটা নিয়ামত ছিলো তাবলীগ ও কাওমী উলামায়ে কেরাম। এখন দুইটাই ধ্বংসপ্রায়। বুখারি শরীফের এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, একবার হযরত জিবরাইল আলাইহিস সালাম এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:)! আপনার

উম্মতের মধ্যে ফিতনা প্রকাশ পাবে। নবীজী (সা:) বললেন, কোন দিক থেকে? জিবরাইল (আ:) বললেন, সরকার ও আলেমসমাজের পক্ষ থেকে। নবীজী (সা:) জিজ্ঞাসা করলেন, কিভাবে? জিবরাইল (আ:) বললেন, সরকার লোকদের উপর জুলুম করবে এবং আলেমরা সরকারের অনুগত হবে। যেমন এখন হিন্দুস্তানের পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) অবস্থা। সেখানে হাসিনা জালেম সরকার এবং কাওমী উলামারা হাসিনার অনুগত। চুরি, জিনা, মদ পান এগুলো এতটা ক্ষতিকর নয় যতটা ক্ষতিকর আলেমসমাজ সরকারের অনুগত হওয়া। স্পেনে আলেমসমাজের কারণেই আযাব এসেছিলো এবং সেই আযাবের কারণে মুসলিম রাষ্ট্র স্পেন এখন অমুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, যা ভূমিকম্প বা ঘূর্ণিঝড় হতে বড় আযাব। পূর্ববঙ্গের আলেমসমাজ সরকারের অনুগত হয়ে গেছে। আল্লাহ পাকের গোস্বাকে ঠান্ডা

করার মতো জামাত আল্লাহর রাস্তায় চলছে না। পূর্ববঙ্গ (বাংলাদেশ) এখন আযাবে গ্রেপ্তার হওয়ার উপযুক্ত। শাহ্ নেয়ামাতুল্লাহ (রাহি:) ৫৭০ হিজরীতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) মুসলমানদের রক্ত শহরে মুসলমানদের রক্তের বন্যা হবে। হিন্দুরা এই কাজ করবে। দুই ঈদের মাঝখানে এই ঘটনা ঘটবে। যে সময় পূর্ববঙ্গের বাদশাহ যে থাকবে তার নামের প্রথম অক্ষর 'শীন' ও শেষের অক্ষর 'নুন' থাকবে (যেমন বর্তমানে পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী)। [গুগলে "শাহ নেয়ামাতুল্লাহ রহঃ এর ভবিষ্যৎ বাণী ।। বাংলাদেশ পরিস্থিতি এবং গাজওয়াতুল হিন্দ" লিখে সার্চ দিলে কাসিদাটি পাওয়া যাবে ইনশাআল্লাহ]

একবার নবীজী (সা:) পূর্বদিকে তাকালেন তখন তাঁর পবিত্র চোখে পানি এসে গেলো। তিনি জানালেন, পূর্বদিকে আমার এই পরিমাণ উম্মতকে হত্যা করা হবে যে রক্তে তাদের টাখনু পর্যন্ত ডুবে যাবে। তাই এখন পূর্ববঙ্গে আযাব আসা খুব স্বাভাবিক, বিশেষ করে ঢাকা ও টঙ্গীতে। কারণ ঢাকা ও টঙ্গীর সাথীরাই তাবলিগের এই পবিত্র মেহনতের সাথে বেশি খেয়ানত করেছে, মফস্বল ও গ্রামের সাথীরা এতটা করেনি। আযাব পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) বর্ডার পর্যন্ত চলে এসেছে। মায়ানমারে বৌদ্ধরা এবং আসামে হিন্দুরা মুসলমানদেরকে যেভাবে হত্যা করছে বাংলাদেশের মুসলমান বিশেষ করে আলেমসমাজ

ও তাবলিগওয়ালাদের উপর একরকম আযাব যে কোনো সময় আসবে, (যদি আল্লাহ পাক চান)। শাহ নেয়ামাতুল্লাহর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই কুরবানির ঈদের (কিংবা আগামী কুরবানীর ঈদের) আগেই এই আযাব আসার সম্ভাবনা খুব বেশি (যদি আল্লাহ পাক চান)। পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) অধিকাংশ পুলিশ প্রধান এখন হিন্দু, নাস্তিক এবং অগণিত পুলিশ, বিজিবিতে ইন্ডিয়ান হিন্দুরা মুসলমান পরিচয়ে যোগ দিয়েছে। একটা গন্ডগোল দেখিয়ে এইসব পুলিশ দাড়ি-টুপিওয়ালাদের, বিশেষ করে আলেমদের হত্যা করবে। যারা আমরা তাবলীগের পবিত্র মেহনতকে ধ্বংস করেছি, তাদের উপর আযাব আসা খুব স্বাভাবিক। আর যদি সত্যি সত্যি বাংলার মুসলমানদের হত্যা করা শুরু হয়, তাহলে তা হবে গাযওয়াতুল হিন্দের পটভূমি।

ইমাম আব্দুল কাদির (রাহিঃ) বলেছেন, ১৪০০ হিজরীর শুরুতে ইমাম মাহদির জন্ম হবে। সে হিসেবে ১৪০১ হিজরী (১৯৮১ সালে) ইমাম মাহদির জন্ম এবং ১৪৪১ হিজরীতে (২০২০ সালে) উনি আত্মপ্রকাশ করার কথা। ২০২০ সালে ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা খুবই বেশী, কারণ আমরা যতটুকু শুনেছি, মাওলানা ইলিয়াস সাহেব (রাহিঃ) ১৯২০ সালে প্রথম ৩ দিনের জামাত বের করেন। তিনি ছিলেন গত শতাব্দির মুজাদ্দেদ। ১০০ বছর পর এই শতাব্দির মুজাদ্দেদ হিসেবে ২০২০ সালে ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশ ঘটবে, ইনশাআল্লাহ। মাওলানা সাদ সাহেবও গতবছর (২০১৮ সালে) একথা বলেছেন বলে শুনেছি যে, দুই বছরের মধ্যে ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশ ঘটবে এবং উনি নিজে তাবলিগের মেহনতকে ইমাম মাহদির হাতে সমর্পণ করবেন। তাছাড়া বিশ্বের অনেক আলেমরাই এই বিষয়ে একমত প্রকাশ করেছেন যে ২০১৯-২০২৪ সালের মধ্যে ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশ ঘটবে, ইনশাআল্লাহ। এহেন পরিস্থিতিতে আমাদের আল্লাহ পাকের সাহায্যের বড় প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের ঈমান-আমল কি সেই উপযুক্ত হয়েছে যা দ্বারা আমরা চাইলে আল্লাহ পাক আমাদেরকে সাহায্য করবেন?

আমরা ২০০৭ সালে বাংলাদেশের টঙ্গী

ইস্তেমা দেখেছি। বৃহস্পতিবার রাত হতে অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল। শুক্রবার সকালেও বৃষ্টি। দিন যত গড়াচ্ছিল বৃষ্টির পরিমাণও তত বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। মিম্বার থেকে একটু পরপর দোয়া হচ্ছে, আল্লাহুম্মা হাওয়ালাইনা ওয়ালা আলাইনা। কিন্তু বৃষ্টি তো থামে না। আমাদের হিন্দুস্তানের তিন মারকাজের (ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান) মুরুব্বিরা, তাবলিগের সকল জিম্মাদার সাথিরা এবং লাখো লাখো দেশ বিদেশের সাথিরা সবাই সারাদিন দোয়া করলেন, আর আল্লাহ পাক কারো ডাকে সাড়া দিলেন না। বাধ্য হয়ে আমাদের মুরুব্বিরা সেই রাতেই ইস্তেমা শেষ করে দিলেন। ইনারা সকালে সাহাবী (রাযি:)-দের সাথে আল্লাহ পাকের নুসরতের কাহিনী বলে বলে মানুষকে আল্লাহ পাকের রাস্তার জন্য তাশকিল করেন, অথচ ইনারা সকলে মিলে সেই দিন বৃষ্টি বন্ধের দোয়া করেও

আল্লাহ পাকের কোনো সাহায্য পেলেন না।

আমরা ২০১৩ সালে পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশের) মতিঝিলের শাপলাচত্ত্বর দেখেছি। উলামা ও মাদরাসা ছাত্রদের এত বড় সমাবেশ ইতিপূর্বে হয়েছে কিনা আমাদের জানা নেই। দিন শেষে সকলেই খুব দোয়া করলেন, কাঁদলেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের সাহায্য এলো না। বরং রাতের বেলায় লাইট নিভিয়ে আলেম ও ছাত্রদের হত্যা করা হলো। এবং আজব ব্যাপার হলো রাতে মুষলধারে বৃষ্টি দিলেন, মনে হয় যেনো আল্লাহ পাক জ্যালেমদেরই পক্ষে ছিলেন এবং রাস্তা থেকে আলেমদের রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করার জন্য বৃষ্টি দিলেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় সকল আলেম, পীর সাহেব ও অবুঝ ছাত্রদের সম্মিলিত দোয়ায় আল্লাহ পাক কোনো সাড়া দিলেন না, কেনো?

(যদিও কথাগুলো অনেকের কাছে ভালো লাগবে না, তথাপি আমাকে সত্য বলতেই হবে। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। এখন মুখলজ্জার আর সময় নেই!) আলেমগণ নিজেদেরকে নবীর ওয়ারিশ দাবী করেন, কেবল সম্মান পাওয়ার জন্য, কিন্তু নবীদের মতো ইনাদের দোয়া কবুল হয় না। কারণ নবীদের সাথে ইনাদের জীবনের কোনো মিল নেই। তাবলিগের শুরা, জিম্মাদার সাথি ও সাধারণ

সাথি কারো জীবনের সাথে আমাদের নবীজী (সাঃ) বা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমদের জীবনের কোনো মিল নেই। না ইবাদাতের ক্ষেত্রে মিল আছে, না ঘর বাড়ির আসবাব পত্রের সাথে মিল আছে, না লেবাসের ক্ষেত্রে মিল আছে, না খানাপিনার ক্ষেত্রে মিল আছে, না জীবনের উদ্দেশ্যের সাথে মিল আছে। নবীজী (সাঃ) ইরশাদ ফরমান, আমার পর তোমরা আবু বকর ও ওমরের (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) অনুসরণ করো। হযরত আবু বকর (রাঃ) ইসলামপূর্ব যুগে মালদার ছিলেন। ইসলামে তিনি যত পুরাতন হয়েছেন, তত নিঃস্ব হয়েছেন, দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়েছেন, আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক তত মজবুত হয়েছে। এখন মাদরাসার মুহতামিম সাহেব ও পীর সাহেবরা শুরুতে সাধারণ মানুষ থাকেন। আর যত পুরাতন হতে থাকেন তত টাকার সাথে সম্পর্ক বাড়তে থাকে। আগে টিনের ঘরে থাকলে পরে আলিসান ফ্ল্যাট বা

নিজের বাড়িতে থাকেন। আগে সাইকেলে চড়লে পরে হেলিকপ্টারে চড়েন। আগে সাধারণ মানুষের সাথে মিশতেন, এখন নারী প্রধানমন্ত্রীর (যেমন: শেখ হাসিনা) সাথে মুসাফাহা করেন। তাবলীগের সাথীরা পুরাতন হতে থাকেন আর খেদমত বিমুখ হতে থাকেন। হালকা, পয়েন্ট, নিযামুদ্দিন কিংবা কাকরাইলের মাশোয়ারা ছাড়া অন্য সকল আমল বাদ দিতে শুরু করেন। বড়দের সাথে বেয়াদবি ও ঝগড়া করা শুরু করেন। এখানে পুরাতন সাথী মানেই ভালো বয়ান করতে পারেন। ইনারা ইজতেমাতে, জোমাতে ও বড়দের মেহমানদারির নামে খাওয়াদাওয়ার যে ভোজের আয়োজন করেন ও খায়েশ পূর্ণ করেন, আর বয়ানের সময়, আবু বকর (রা:)-এর স্ত্রীর মিষ্টি খাওয়ার ঘটনা, বকরীর মাথা সাত বাড়ি ঘুরে আবার প্রথম বাসায় আসার ঘটনা বা ওমর (রা:)-এর ঘি থাকার কারণে খানা হতে হাত গুটিয়ে নেয়ার ঘটনা বর্ণনা করেন, তখন আসমানে নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক খুশি হন না। ভয় হয়, ইনাদের ঠোঁট যদি আগুনের কাচি দ্বারা কাটা হয়!

মাওলানা ইলিয়াস সাহেব রহিমাহুল্লাহ বলেছিলেন, তাবলিগের মেহনতের উদ্দেশ্য হলো, নবীজী (সা:) দুনিয়া হতে চলে যাওয়ার সময় মদিনাতে সাহাবী (রা:)-দেরকে ইসলামের যেই স্তরে রেখে গিয়েছিলেন উম্মত আবার সেই স্তরে ফিরে যায়। আজকে

দ্বীনওয়ালা সাহাবীদের মতো আলেম বা তাবলিগের সাথি আদৌ খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। তাই আমাদের মাদরাসায় এলেম শিক্ষা করা বা তাবলিগে সাল, তিন চিল্লা বা বিদেশ সফরের মাধ্যমে আসল মঞ্জিলে আমরা পৌঁছাতে পারিনি। আমাদের জীবনে ইসলাম আসেনি। হাশরের ময়দানে একথা জিজ্ঞেস করা হবে না, তুমি দেওবন্দের আলেম কিনা, তুমি কোনো পীর সাহেবের খিলাফত পেয়েছিলে কিনা, কুরআন তিলাওয়াতে আন্তর্জাতিক কোনো পুরস্কার পেয়েছিলে কিনা, বিদেশ সফর করেছিলে কিনা, নিযামুদ্দিন কিংবা কাকরাইলের শুরা হতে পেরেছিলে কিনা, টঙ্গী ময়দান দখল করতে পেরেছিলে কিনা। এগুলো আল্লাহ পাকের কাছে কোনো মূল্য রাখে না যদি যিন্দেগীতে দ্বীন না আসে। তাই হাশরের ময়দানের প্রথম প্রশ্নই হলো, তোমার জীবন কেমন ছিলো? সারা জীবন তাবলিগ করে বা মাদরাসার মুহতামিম, পীর হয়ে বা উস্তাদ হয়েও যদি টাকা ও সম্মানের লিপ্সা

নিয়ে কবরে পৌঁছি তাহলে সেইদিন সব বৃথা হবে।

বর্তমানে ইসলামের যে শেকেল আমাদের সামনে আছে সেটা প্রকৃত ইসলাম নয়। হাদিসে পাকে এরশাদ হয়েছে, ইসলাম যেমন শুরুতে অপরিচিত ছিলো আবারো তা অপরিচিত হয়ে যাবে। অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে, মানুষের উপর এমন এক যামানা আসবে যখন ইসলামের নামটুকু ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। কুরআনের অংকিত হরফ ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। (সেই যামানার আলামত হলো,) মসজিদগুলো তখন সুসজ্জিত থাকবে, কিন্তু হেদায়েত থেকে খালি হবে। তখন আলেমরা হবে আসমানের ছায়ার নিচে সবচেয়ে নিকৃষ্ট বান্দা। এরাই ফিতনা সৃষ্টি করবে এবং সেই ফিতনায় নিজেরাই পতিত হবে। তাই আমাদের জন্য জরুরি হলো প্রকৃত ইসলাম যা সাহাবায়ে কেরামের যিন্দেগীতে ছিলো সেই ইসলামের অনুসরণ করা। আমি ইসলামের উপর আছি কিনা সেটা আমাকে যাচাই করতে হবে হাদিস দেখে; আলেম, পীর সাহেব বা মুহতামিম সাহেবদের যিন্দেগী দেখে নয়। এক সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাঃ)! ইসলামের নূর কারো দীলে প্রবেশ করেছে কিনা এটা চিনবার আলামত কি? নবীজী (সাঃ) এরশাদ ফরমান, এই ধোকার ঘর থেকে তার দীল উঠে যাবে, চিরস্থায়ী ঘরের জন্য অস্থির হয়ে উঠবে এবং মৃত্যু আসার আগেই সে মৃত্যুর জন্য তৈরি হয়ে যাবে।

এই ধোকার ঘর হতে যদি কারো দীল উঠে যায় সে কি টাকা পয়সা, ঘরবাড়ি, সম্মান ও জিম্মাদারি হাসিল বা সরকারের চাটুকারি করবে? যে চিরস্থায়ী ঘরের জন্য অস্থির হয়ে আছে, দুনিয়ার কোনো জিনিস কি তাকে আনন্দ দিবে? যে মৃত্যুর অপেক্ষা করছে সে কি সত্য কথা বলতে শাসকের ভয় করবে? দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম, নিযামুদ্দিন বা কাকরাইলের মুরুব্বি বা জিম্মাদার সাথি হয়েও যদি এই তিনটি আলামত আমাদের মাঝে না থাকে, তাহলে আমরা এখনো ইসলাম পাইনি বা মুসলমান হইনি। আমার ইসলাম যেনো আমাকে দুনিয়া বিসর্জন দিতে শিক্ষা দেয়, দুনিয়া কামাইয়ের মাধ্যম না হয়।

এতায়াতের সাথীদের প্রতি আরজ করি, নিজেদের প্রতি রহম করি। দলাদলি, মারামারি করে কোনো লাভ নেই। এটা আল্লাহ পাকের নিষেধ। আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমান, আল্লাহর রশি

(অর্থাৎ পূর্ণ শারীয়ত)-কে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো, দলাদলি করো না।

(সকল উম্মতের প্রতি,) নিজেদের কামাই রোজগারকে পবিত্র করি, তাকওয়া অবলম্বন করি। যেসকল কামাইয়ের জন্য আমাকে সুন্নত ছেড়ে দিতে হয় তা বর্জন করি। যেমন দুপুরে বিশ্রাম নেয়া সুন্নত। কিন্তু আমার অফিসের চাকরি বা ব্যবসা আমাকে দুপুরে বিশ্রাম নিতে দেয় না। এই চাকরি বা ব্যবসা করে কী লাভ? এক সুন্নতের বিনিময়ে সাত আসমান যমিন কী মূল্য রাখে? নিজেদের লেবাস পোশাকের ও খানাপিনার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন যা হয় তা অবলম্বন করি। আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ করার ক্ষেত্রে খুব চোকান্না হই। ধারকর্জ করা থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকি। যেই ব্যবসা করার সামর্থ আমার নেই সেই ব্যবসার জন্য ধার করা লোভ ও গুনাহ। গরিব সাথিরা ধনী সাথিদের থেকে দ্বীনী কোনো কারণে অর্থ গ্রহণ না করা চাই। এতে তার গোলাম হয়ে থাকতে হবে এবং হক কথা বলা কঠিন হবে। তাছাড়া ধনীদের সাথে উঠাবসা করলে দীলের মধ্যে তার মালের প্রতি তামান্না আসতে পারে এবং ধনী সাথির করুণার পাত্র হতে হবে, যা হবে আল্লাহ পাকের গোস্বার কারণ। যেসব সাথিরা গার্মেন্টস ব্যবসার সাথে জড়িত তারা নিজেদের প্রতি দয়া করি। আখিরাতে তাকওয়া কাজে আসবে, এই জামানার মুফতি সাহেবদের ফতোয়া অকার্যকর হয়ে যেতে পারে।

হাদীসে পাকে এরশাদ হয়েছে, হালাল সঙ্কীর্ণ রাস্তা দিয়ে আসে, আর হারাম আসে প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে। সাথিরা আরাম আয়েশের সকল উপকরণ ত্যাগ করি, নিজেদের প্রতি রহম করি। নিজেদের ঘরের সামানপত্র ও নবীজী (সা:) - এর ঘরের সামানপত্র তুলনা করি। খাট, সোফা, টেবিল ও অন্যান্য সামান পরিত্যাগ করে নিজেকে হালকা পাতলা রাখি, এই হুকুম কুরআনে এসেছে এবং যথার্থ। নিজেকে কিয়ামতের হিসাবের জন্য সহজ রাখি, নিজের প্রতি রহম করি। হারাম ও কবীরা গুনাহ হতে খুব সাবধান থাকি। মিডিয়া, মোবাইল, কম্পিউটার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকি। এগুলো অনেক গোনাহের কারণ হয়।

(বাংলাদেশের মুসলমানদের প্রতি,) আমি পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) আযাব আসার ব্যাপারে স্বপ্ন দেখেছি এবং আল্লাহে পাক আমাকে বলেছেন, 'আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে আমি অনেক বেশি ক্ষমা করনেওয়ালা। আমার বান্দাদের একথাও জানিয়ে দাও যে

আমার আযাব বড় শক্ত। আর তাদেরকে ইব্রাহিম,
আলাইহিস সালামের মেহমানদের কথা জানিয়ে দাও।
তাই সকল সাথীরা মেহনতের সাথে আমাদের খেয়ানতের
উপর তাওবা করি এবং আল্লাহ পাকের আযাবের ভয় করি।
আল্লাহ পাক ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের মেহমানদের
কথা কেন বলতে বললেন জানিনা। সংক্ষেপে ঘটনাটা
হলো, আল্লাহ পাক ইবরাহিম আলাইহিস সালামের
নিকট ফেরেশতা পাঠালেন। তারা মানুষের শেকেলে নবীর
নিকট এলেন। আল্লাহর নবী তাদেরকে মেহমান ভেবে গরু
ভুনা করে সামনে পেশ করলেন। তারপর বিসমিল্লাহ
বলে খাওয়া শুরু করলেন ও মেহমানদের খেতে বললেন।
কিন্তু মেহমানরা ফেরেশতা হওয়ায় তাদের খানার প্রয়োজন
ছিল না এবং সেই খানায় হাতও দিলেন না। এতে
ইবরাহিম আলাইহিস সালাম ভীত হলেন, তিনি তাদেরকে
অশুভ ও শত্রু মনে করলেন। তখন ফেরেশতারা
বললেন, ভয় পাবেন না, আমরা আল্লাহ পাকের পক্ষ
থেকে দূত। আল্লাহ পাক আপনাকে পুত্র সন্তানের
সুসংবাদ দিয়েছেন এবং হযরত লূত আলাইহিস সালামের
কওমকে শাস্তি দেয়ার জন্য আমাদেরকে পাঠিয়েছেন।
হযরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম অবাক হলেন যে,
তিনি বৃদ্ধ ও তার স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা, এমতাবস্থায়
সন্তান কিভাবে হবে! ফেরেশতারা নবীকে বললেন,
আপনি আপনার পরিবার নিয়ে রাতের কিছু অংশ
বাকি থাকতে এলাকা হতে বের হয়ে যান, পিছনে ফিরে
তাকাবেন না। সকালে আযাব আসবে। যাই হোক,

আমি যতটুকু বুঝেছি, সাথিরা যেনো আল্লাহ পাকের ক্ষমতার উপর ভরসা রাখে। আল্লাহ পাক যা চান তাই হয়, যদিও জাহেরিভাবে তা অসম্ভব মনে হতে পারে। আর হয়ত পূর্ববঙ্গে (বাংলাদেশে) বড় কোনো আযাব আসছে।

সামনে যে কোনো সময় ইমাম মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে, ইনশাআল্লাহ। তাই সকল সাথিরা নিজেদের জেহেনকে এর জন্য তৈরি করতে থাকি। বিবি বাচ্চাদেরকে হযরত ইবরাহিম আলাইহিস্ সালামের কুরবানির মুজাকারা বারবার শুনাতে থাকি, যেনো তারাও হাজেরা ও ইসমাইল আলাইহিস সালামের মতো কুরবানি করার জন্য তৈরি হয়ে যায়। যে আল্লাহ পাকের জন্য প্রয়োজনে নিজের জানমাল, বিবি বাচ্চা, সবকিছু পিছনে ফেলে জিহাদের জন্য বের হতে পারবে না, সে আসলে মুসলমানই হতে পারেনি।

আমাদের জিহাদের জন্য মূল শক্তি হলো আল্লাহ পাকের সাথে সম্পর্ক ও মূল হাতিয়ার হলো দোয়া।
আমাদেরকে এমন মুসলমান হতে হবে যেনো আমরা হাত উঠালে আল্লাহ পাক সেই হাত খালি ফিরিয়ে দিবেন না।

এর জন্য দুনিয়ার সাথে সম্পর্কহীনতা, কোনোভাবে জীবন ধারণের মতো খাদ্যের উপর সন্তুষ্ট হওয়া, এক বা দুইটা জামা, এবং সকল খাহেশ থেকে নিজেকে বিরত রাখা জরুরি। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে আমল করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

ওয়াস্‌সালাম।

[যেহেতু এটি একটি নোটপ্যাড আর এখানে কপি-পেস্ট করার সুযোগ নেই। বরং চিঠিটি আমাকে দেখে দেখে লিখতে হয়েছে। তাই, আমার ভুল হতেই পারে। তবে এতে চিঠির মূল অর্থের কোনো ব্যতিক্রম হয়নি ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাকে মাফ করুন।]

আল্লাহ পাক আমাকে বলেছেন,
'অধিকাংশ মানুষ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না, যতক্ষণ না তারা নিজের চোখে আযাব প্রত্যক্ষ করবে।'
- [খলীফাতুল্লাহ আল মাহদি]

পূর্ব মানে কী

পূর্ব দিকের দেশ বলতে খোরাসান খাস নয়, পূর্ব দিকের যে কোনো দেশই হতে পারে। হিন্দুস্তানের অনেক আলেমের মতে "মদীনা" বলতে নবীজী (সা.)-এর মদীনা মুনাওয়ারাই উদ্দেশ্য। তার অর্থ দাঁড়ায় "তিনি সৌদি আরবের মদীনায় জন্মগ্রহণ করবেন, পরে পূর্ব দিকে হিজরত করবেন, সেখানে লোকজন তাকে চিনার কারণে প্রকাশ ঘটবে, অতঃপর তিনি মক্কায় আবারো হিজরত করবেন।" আল্লাহ তা'আলা চাইলে সবই সম্ভব, তবে ইমাম মাহদী দুইবার হিজরত করবেন (মদীনা হতে পূর্ব দিকে, পুনরায় পূর্ব দিক হতে মক্কার দিকে) এমন কোনো হাদীস আমার জানা মতে নেই। তিনি যে পূর্ব দিক হতে হিজরত করবেন এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। একটা ব্যাপার জানেন? সৌদি আরবের মদীনা শহরটি মক্কা হতে উত্তর দিকে অবস্থিত। অন্যদিকে আরবের উলামায়ে কেরাম এ কথা বিশ্বাস করেন যে, ইমাম মাহদী পূর্ব দিক হতেই আসবেন। মদীনা বলতে তারা সৌদির মদীনা বুঝান না। অথচ উনাদের এ ব্যাপারে হিন্দুস্তানের আলেমদের চেয়ে বেশি দাবীদার হওয়ার কথা ছিল। কেননা তারা আরবের সন্তান। আমাকে বলুন, আরবের উলামায়ে কেরামগণ কি বুঝেননি, এখানে "মদীনা" বলতে সৌদির মদীনা উদ্দেশ্য কিনা?

حدثنا الوليد بن مسلم، عن صدقة بن خالد، عن عبد الرحمن بن حميد، عن مجاهد، عن تبيع، قال: سيعوذ بمكة عائذ فيقتل، ثم يمكث الناس برهة من دهرهم، ثم يعوذ عائذ آخر، فإن أدركته فلا تغزونه، فإنه جيش الخسف».

[935] رواه نعيم بن الحماد

"তুবাঈ রহ. বলেন, অচিরেই মক্কায় একব্যক্তি আশ্রয়গ্রহণ করে নিহত হবে। অতঃপর মানুষ কুরহা কাল অবস্থান করবে। এরপর আরেকব্যক্তি আশ্রয়গ্রহণ করবে। যদি তুমি তাকে পাও তবে তার বিপক্ষে যুদ্ধ করো না। নিশ্চয়ই সে হলো খাসাফের বাহিনী।"

তুবাঈ বিন আমের রহ. একজন তাবেয়ী। তিনি ইহুদি আলেম কা'বে আহবারের স্ত্রীপুত্র, তার কাছে ইলম শিখেন, তাওরাত-ইঞ্জীল ইত্যাদি আসমানি কিতাব পড়েন। হতে পারে তিনি এ বিষয়গুলো কা'বে আহবারের কাছে কিংবা পূর্ববর্তী আসমানি কিতাবাদীতে

পেয়েছেন। উল্লেখ্য, হাদিস শাস্ত্রের মূলনীতি অনুযায়ী, কোনো সাহাবী বা তাবেয়ী ভবিষ্যতের বিষয়াদী বর্ণনা করলে, সেটা তারা কোন না কোন ভাবে রাসূলের তরফ থেকেই জেনেছেন বলে ধরা হয়। আর ইসরাঈলী বর্ণনার ব্যাপারে হাদিসের নির্দেশনা হলো,

لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ، وقولوا - آمنا بالله وما أنزل إلينا - وما أنزل إليكم « صحيح البخاري (7362)

" তোমরা আহলে কিতাবদের বর্ণিত বিষয়াদী সত্যায়ন করো না এবং মিথ্যা প্রতিপন্নও করো না। বরং তোমরা বলো, আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি এবং সেই বাণীর প্রতিও যা আমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে এবং তার প্রতিও যা তোমাদের উপর নাযিল করা হয়েছে।"

(خسف) খাসাফ শব্দটির অর্থ করা হয় ভূমি-ধ্বস। যদিও এর অর্থ গ্রহণ-3 হতে পারে। কিন্তু, এখানে যে অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হলো সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া।

১৯৩৬ সালে নযদের এক সম্ভ্রান্ত ও প্রভাবশালী পরিবারে জন্মগ্রহণকারী জুহাইমান, যে আবু মুহাম্মাদ নামে পরিচিত ছিল, ১৮ বছর বয়সে "সৌদি জাতীয় গার্ডের" (Saudi National Guard) সাধারণ কর্মী হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেছিল। ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত কর্মরত থাকার পর অবশেষে সে সেনাবাহিনী ত্যাগ করে। এরপর সে মদিনায় চলে যায়, যেখানে সে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে এবং তার ভবিষ্যৎ ভগ্নিপতি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল-কাহতানির সাথে দেখা হয়। এক বর্ণনা মতে জেল খানায় বন্দী অবস্থায় তাদের মাঝে পরিচয় হয়। আল কাহতানির সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার পর জুহাইমানের জীবনের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে। তার বোনের সাথে কাহতানির বিবাহ হয়। জুহাইমান মদিনার কিছু ছোট মসজিদে তাদের আত্মশুদ্ধি বা পরিত্রানের ধারণা প্রচার করতে শুরু করে। তাদের এই মতবাদ ইতিবাচকভাবে কিছু মানুষের দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। জুহাইমান যেহেতু পূর্বে সেনা সদস্য ছিল, সেহেতু তার সেনাবাহিনীর সাথে লিংক ছিল। সেখানে সে দাওয়াতী কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হয়। এতে সেখানে তার কিছু অনুসারীও

জুটে যায়। এভাবে জুহাইমানের প্রতিষ্ঠিত দলটি বেড়ে উঠতে শুরু করে, যতক্ষণ পর্যন্ত না দেশে বিদেশে তার সদস্যদের সংখ্যা হাজারে বৃদ্ধি পায়। জুহাইমান কাহতানিকে বলেছিল যে, সে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বপ্ন দেখেছে, স্বপ্নে তাকে বলা হয়েছে যে, (তার ভগ্নিপতি) কাহতানি "ইমাম মাহদি"। এবং তিনি আরব উপদ্বীপ এবং সমগ্র বিশ্বের বাতিলকে মিটিয়ে দিবেন। মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল কাহতানি এবং জুহাইমানের অনুগামীদের মধ্যে অনেকেই মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্ব বিভাগের ছাত্র ছিল। বাকিরা এসেছিল মিশর, ইয়েমেন, কুয়েত, ইরাক এবং আরও ছিল সুদানের কিছু নিগ্রো মুসলিম। তাদের অনুসারীরা এই মতবাদ মেনে নেয়, কেননা আল-কাহতানির নাম এবং তার পিতার নাম; হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর নাম ও পিতার নাম একই। উপরন্তু, তারা আক্রমণের দিন হিসেবে (২০ নভেম্বর, ১৯৭৯) ১৪০০ হিজরী সালের প্রথম দিন নির্ধারণ করে, কারণ হাদীস অনুসারে প্রত্যেক শতাব্দিতে একজন মুজাদ্দিদের আগমন হয়।

ফিতনায়ে হারাম

ফেতনায়ে হারাম

স্থান : মক্কার পবিত্র মাসজিদুল হারামের আঙ্গিনা।

সময় : পহেলা মুহাররাম, ১৪০০ হিজরী, (২০ নভেম্বর ১৯৭৯ ইসায়ী) এর ভোর।

দৃশ্য : হাজার হাজার ইবাদতকারী মাসজিদে ঢুকছেন, যেমনটি হয়ে থাকে। এরই মধ্যে কয়েক ডজন শোকার্ত মানুষ তাদের কাঁধে মৃতদের কফিন বহন করে মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করে। ইবাদাতকারীগণ ও মাসজিদের নিরাপত্তা রক্ষীগণ এত সংখ্যক মৃত লোকের কফিন দেখে হয়তো সেদিন আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা মাসজিদুল হারামে কফিন দেখতে অভ্যস্ত ছিলেন। যেহেতু প্রায় প্রতি ওয়াক্তের পর এখানে কোনো না কোনো জানাযা থাকেই। কফিনগুলির ভেতরে আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিল, যা জুহাইমান আল-ওতাইবির নেতৃত্বে একটি দল এই দিনটির জন্যই হয়ত প্রস্তুত করেছিল। ফযরের নামায কেবল শেষ হতে চলেছে। হঠাৎ সাদা কাপড় পরা প্রায় শ দুয়েক লোক অস্ত্র হাতে নিয়ে বেরিয়ে গেল। কয়েকজন অস্ত্রধারী গিয়ে অবস্থান নিল ইমামের চারপাশে। ইমাম যখন সবে নামায শেষ করলেন, অস্ত্রধারীরা মাইক্রোফোনের নিয়ন্ত্রণ নিল। জুহাইমান আল-ওতাইবি এবং মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ আল-কাহতানি পবিত্র মসজিদের ইবাদাতকারীদের সামনে দাঁড়ালো এবং জুহাইমান উম্মতের সামনে ঘোষণা করল যে, " ইমাম

মাহদীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তিনি হিজর ইসমাইল (হাজরে আসওয়াদ) এবং মাক্বামে ইবরাহীমের মাঝামাঝি স্থানে বাইয়াত গ্রহণ করবেন।" ঘোষণা শুনে মানুষ তাকবীর দেওয়া শুরু করল। জুহাইমান পবিত্র কাবা ঘরকে ঘিরে একটি অবরোধ তৈরির নির্দেশ দিল। মাসজিদের মিনারগুলোতে জুহাইমান বন্দুকধারীদের অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিল, যাতে কেউ হামলা করলে তাদের প্রতিরোধ করা যায়। বন্দুকধারীদের মোকাবিলায় প্রথম চেষ্টা ছিল খুবই কাঁচা। অল্প সংখ্যক ন্যাশনাল গার্ড এবং সামরিক বাহিনীর সদস্য প্রথম সেখানে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের গুলি করে মেরে ফেলা হয়। সৌদি সরকার এরপর সেখানে হাজার হাজার সৈন্য এবং কমান্ডো পাঠায়। পাঠানো হয় সাঁজোয়া যান। মক্কার আকাশে উড়তে থাকে যুদ্ধ বিমান। কাবা এবং হারাম শরীফের ভেতরে সামরিক অভিযান চালানোর জন্য সৌদি সরকার দেশটির ধর্মীয় নেতাদের কাছে অনুমতি চাইল। প্রথম ছত্রিশ ঘন্টা তারা কোনো সাড়াশব্দ করেননি। এরপর অনুমতি দিলেন।

পরবর্তী কয়েকদিন সেখানে তীব্র লড়াই শুরু হলো। সৌদি সরকারি বাহিনী একের পর এক হামলা চালাতে লাগল। মাসজিদের একটি অংশ বেশ ক্ষতিগ্রস্থ হলো। শেষ পর্যন্ত সৌদি বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি মাসজিদ চত্বরে ঢুকল। বেশিরভাগ যোদ্ধা তখন মাসজিদের ভূ-গর্ভের করিডোরে গিয়ে আশ্রয় নিলো। সেই অন্ধকার জায়গা থেকেই তারা পরবর্তী কয়েকদিন ধরে লড়াই করে গেল। লড়াই আরো তীব্র হতে লাগল। এদিকে মক্কাকে ঘিরে এই অবরোধের অবসানের জন্য সৌদিরা তখন ফরাসি সামরিক অধিনায়কদের সঙ্গে সলাপরামর্শ শুরু করল। ফরাসি বিশেষ বাহিনীর এই অধিনায়কদের গোপনে সৌদি আরব পাঠানো হয়। তারা পরামর্শ এবং অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছিল। এরা মাসজিদের ভূ-গর্ভে যেখানে হামলাকারীরা লুকিয়ে ছিল, সেখানে বিপুল পরিমাণ সিএস গ্যাস ছাড়ার পরামর্শ দিলো। শেষ পর্যন্ত সতের দিন পর জুহাইমান তার জীবিত সাথীদেরকে নিয়ে আত্মসমর্পণ করে। সৌদি টেলিভিশন সম্প্রচার বাধাগ্রস্ত হয়েছিল এবং নাইফ বিন আব্দুল আজিজ পর্দায় উপস্থিত হলো। সে ঘোষণা করলো, পবিত্র মাসজিদের আঙ্গিনা বিদ্রোহীদের থেকে পাক করা হয়েছে। এই মাধ্যমে সৌদি আরবের আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন একটি সময়ের ইতি টানা হলো।
মুসলিমদের পবিত্র প্রাচীন এ ঘরের পবিত্রতা নষ্টকারী অপরাধীদের সাজার আওতায় আনা হয়। রাজা খালিদ ইবনে আব্দুল আজিজ আদেশ নং ৪২০৭/২ এর অধীনে গ্রেপ্তারকৃত জুহাইমান গ্যাং সদস্যদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর

করার নির্দেশ দেয়। তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল প্রকাশ্যে শিরচ্ছেদের মাধ্যমে। একই দিনে ৬৩ জন মক্কায়, মদিনায় ৭ জন, রিয়াদে ১০ জন, দাম্মামে ৭ জন, বুরাইদাহে ৭ জন, হাইলে ৫ জন, ৭ জন আভায়, ৫ জনকে তাবুকে হত্যা করা হয়। কুহাইমান তাদের একজন ছিলো যাদেরকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছিল। ৯ জানুয়ারী ১৯৮০ তারিখে এ মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়। ওয়াবহ এই সংঘাতের সর্বশেষ ফলাফল হচ্ছে, সৌদি বাহিনীর ১২৭ জন মারা যায়, ৪৫১ জন আহত হয়। অন্যদিকে আক্রমণকারী কুহাইমান বাহিনীর ১১৭ জন মারা যায় আর ৬৩ জনকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়।

সূত্র:

- https://eng.majalla.com/2009/11/article5510978/the-dream-that-became-a-nightmare
- https://en.wikipedia.org/wiki/1979_Grand_Mosque_seizure
- https://abuse.wikia.org/wiki/Muhammad_bin_abd_Allah_al-Qahtani
- https://en.wikipedia.org/wiki/Mohammed_al-Qahtani

মুহাম্মাদ (সা:)-এর সাথে ইমাম মাহদির কিছু মিল

→ হযরত মুহাম্মাদ (সা:) নবুওয়াত পান ৪০ বছর বয়সে। ইমাম মাহদি আত্মপ্রকাশ করেন ৪০ বছর বয়সে।

→ হযরত মুহাম্মাদ (সা:) থাকতেন মক্কায় আর ইমাম মাহদি থাকতেন টঙ্গীতে। মক্কা ও টঙ্গীর সংখ্যাতাত্ত্বিক মান সমান।

مكة > 40+20+400 > 460 > 4+6+0 > 10

تونجى > 400+6+50+3+10 > 469 > 19 > 10

→ মক্কাতে হজ্জ-ওমরা নিয়ে প্রহসন হয় আর টঙ্গীতে ইজতেমা নিয়ে প্রহসন হয়।

→ হযরত মুহাম্মাদ (সা:) ২৫ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন। ইমাম মাহদি ২৫ বছর বয়সে বিয়ে করেছেন।

→ হযরত মুহাম্মাদ (সা:) মক্কা থেকে হিজরত করেছেন। ইমাম মাহদি টঙ্গী থেকে হিজরত করেছেন।

→ মক্কার লোকেরা হযরত মুহাম্মাদ (সা:)-কে মক্কায় ইসলাম প্রচার করতে বাধা দিয়েছে। টঙ্গীর লোকেরা ইমাম মাহদিকে টঙ্গীতে তাবলীগ করতে বাধা দিয়েছে।

→ ইমাম মাহদি হিজরত করেছেন নবীজীর শহর মদীনা হতে পূর্বদিকে অবস্থিত এক শহর থেকে যে শহরের অক্ষাংশ

২১.৭° উত্তর আর মদীনার অক্ষাংশ ২৪.৪৮° উত্তর।

→ ইমাম মাহদির সন্তানদের নাম – আব্দুল্লাহ, কাসেম, ইবরাহীম ও ফাতিমা। অর্থাৎ উনার কুনিয়াত আবু আব্দুল্লাহ ও আবুল কাসেম।

→ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর মোহরে নবুওয়াতের মত ইমাম মাহদির পিঠেও আলামত বিদ্যমান।

→ হাদীসে এসেছে,

يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي

আমাদের নবীর নাম মুহাম্মাদ এবং উনার বাবার নাম আব্দুল্লাহ। ইমাম মাহদির নাম মুহাম্মাদ এবং উনার বাবার নাম আব্দুল কুদ্দুস। কুদ্দুস আল্লাহর আসমায়ে হুসনার মধ্যে একটি। অর্থাৎ, হাদীস অনুযায়ী উভয়ের নাম ও পিতার নাম সামঞ্জস্যপূর্ণ।

→ ইমাম মাহদিকে স্বপ্নে জানানো হয়েছে যে তিনি আহলে বাইত। হাদীসে এসেছে,

المهدي من عترتي من ولد فاطمة

ইমাম মাহদি একজন আলেম কিনা

মুসলমানদের মাঝে এরকম একটি ধারণা হতে পারে যে ইমাম মাহদি একজন বড় আলেম হবেন বা মাদরাসায় তো অবশ্যই পড়ে থাকবেন। ইমাম মাহদি মাদরাসা পড়ুয়া হওয়া জরুরি নয়। দেখুন,

✓ ইমাম মাহদি মাদরাসায় বা দ্বীনী প্রতিষ্ঠানে পড়বেন বা কোনো ব্যক্তি তার দ্বীনী উস্তাদ হবেন এরকম কোনো হাদীস নেই।

✓ হাদীসের ভাষ্য মতে, যে ব্যক্তি দুনিয়া ত্যাগ করবে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে উস্তাদ ব্যতীতই ইলম (ইলমে লাদুন্নী) শিক্ষা দিবেন। একজন সাধারণ মুমিনের জন্যই যদি এই নিয়ম প্রযোজ্য হয়, তাহলে ইমাম মাহদি আল্লাহ-র খাস বান্দা হওয়া সত্ত্বেও কেন উস্তাদের প্রয়োজন হবে?

✓ মাদরাসায় পড়া ব্যতীত কি দ্বীনের সহীহ আলেম হওয়া যায় না? মাদরাসায় না পড়ে উলামায়ে কেরামের সোহবতে থেকে কি ইলম হাসিল করা যায় না? আল্লাহ তা'আলা চাইলে এই পন্থা ছাড়াও কোনো বান্দাকে ইলম দান করতে পারেন।

✓ আমাদের কাছে কি আলেমের সংজ্ঞা এরূপ – "যে ব্যক্তি মাদরাসায় পড়ে সার্টিফিকেট লাভ করে তাকে আলেম বলে?" সেক্ষেত্রে তো এই সংজ্ঞার মধ্যে

কোনো সাহাবায়ে কেরামও পড়বেন না। ইমাম গাযযালি রহঃ বলেন, " রাসূলুল্লাহ (সাঃ) লক্ষাধিক সাহাবী রেখে গেছেন যাদের মধ্যে অল্প সংখ্যক হাফেয ছিলেন। যার সূরা বাকারা আর সূরা আনফাল মুখস্থ ছিল, তাকেই আলেম ধরা হত।" [এহইয়াউ উলূমিদ্দীন : কুরআন অধ্যায়]

✓ বর্তমানে আমরা অনেকেই হয়তো ভাবি যিনি দ্বীনের সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন আহকামের মাসআলা জানেন, তাফসীর ও বিশুদ্ধ ছয়টি হাদীসের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছেন, তাকেই আলেম বলে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন — لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
[সূরা তাওবা ১২২]

অর্থাৎ ' তারা যেন দ্বীনকে বুঝে নেয়।'

ইহুদি - নাসারারা ও খোদ শয়তানও তো কুরআন - হাদীসের পন্ডিত, কিন্তু আল্লাহর কাছে কি এরা কেউই আলেম? দ্বীন কেবল জানার বিষয় নয়, দ্বীন অনুভব করার বিষয়ও বটে। ইমাম আবু হানীফা বলেন, " যে ব্যক্তি দ্বীনের সমস্ত কিতাব অধ্যয়ন

করে নিলো কিন্তু দ্বীন পুরোপুরি বুঝতে পারলো না," সে কুরআন হাদীসের পরিভাষায় আদৌ আলেম নন।"

✓ আল্লাহ তা'আলার ইরশাদ —

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَاءُ

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই আল্লাহ পাককে ভয় করে।"
[৩৫ সূরা ফাতির : ২৮]

শাইখ মাহমুদ আল হিন্দী বলেন, "প্রকৃতপক্ষে এই আয়াতের অর্থ হলো,

আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্যে আলেম কেবল তারাই যারা আল্লাহ পাককে ভয় করে।

যার প্রমাণ পাওয়া যায়, হাদীস শরীফ থেকে। হাদীসে বর্ণিত আছে, এক সাহাবী রাযি. নবীজী (সা:) কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ (সা:), "সবচেয়ে বড় আলেম কে? তিনি ইরশাদ ফরমালেন, "যে আল্লাহ তা'আলাকে সবচেয়ে বেশী ভয় করে।" শুধু জানার মাধ্যমেই আলেম হওয়া গেলে শয়তান হতো যামানার সবচেয়ে বড় আলেম।"

✓ নবীদেরকে দ্বীন শিখানোর কোনো ওস্তাদ থাকেন না।

তাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ পাক দ্বীন শিক্ষা দেন। আর ইমাম মাহদির মিশন হচ্ছে খিলাফাহ আলা মিনহাজিন নুবুওয়্যাহ কায়েম করা। তাই ইমাম মাহদিকেও হয়তো আল্লাহ পাক নিজেই দ্বীন শিক্ষা দিবেন।

✓ আল্লাহ তা'আলা চাইলে একজন নিরক্ষর মানুষকে দিয়েও বিশ্বজাহানের খিলাফতের দায়িত্ব পরিচালনা করাতে পারেন, আধুনিক যামানার রাহবার বানাতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে আমাদের উম্মী নবী সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল্লিল আলামীন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) - কেই ধরে নেয়া যাক।

তাই আমাদের উচিত, হাদীসে বর্ণিত আলামতগুলো কার মাঝে পাওয়া যায় তা তালাশ করা। যার মাঝে সকল আলামত পাওয়া যাবে তিনিই হবেন ইমাম আল-মাহদি।

ইলম ও আলেম

নিজেকে আমরা যতই হক মনে করি, এটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে যে আমরা সাহাবায়ে কেরামের জামাতের মত পুরোপুরি হক নই? ভুল-ত্রুটি আমাদের মাঝে অবশ্যই আছে। যদিও আমি এই যামানার সবচেয়ে বড় শাইখুল ইসলাম, শাইখুল হাদীস, শামসুল ইসলাম, নয়মুল উলামা, বাহরুল উলুম, আঞ্জুমানে তারজুমান, পীরে কামেল, আলেমে হক্কানী, মাওলানা, মুফতী, ক্বারী, হাফেয, আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বক্তা, দাঈ ইলাল্লাহ, মরদে মুজাহিদ ইত্যাদি যাই হই না কেন। রাসূলুল্লাহ-র রহস্যবিদ সাহাবী হযরত হুজাইফা সাহাবারা জীবিত থাকা অবস্থাতেই মুসলিম সমাজে একটি ফিতনা সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা-র ৩৮,৪৩৭ নং হাদীসে বলা হয়েছে, একদা হুযাইফা মসজিদে ঢুকে দেখলেন, সেখানে কিছু লোক অন্য কিছু লোককে এলেম শিখাচ্ছে। তিনি আফসোস করে বললেন, হায়, তোমরা যদি সঠিক পথের উপর থাকতে! তোমরা অনেক দূরের জিনিসকে নিজেদের জন্য আবশ্যক করে নিয়েছো। একথা বলে তিনি ওদের মাঝে বসলেন এবং বললেন, আমরা ছিলাম সেই কওম যারা এলেম শিখার আগে ঈমান শিখেছি। শীঘ্রই এমন কওম আসবে যারা ঈমান শেখার আগে এলেম শিখবে। লোকদের মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞাসা করলো, তাহলে কি এটাও ফিতনা? তিনি বললেন, অচিরেই এমন কিছু ব্যাপার তোমাদের সামনে আসবে যে তোমরা (সেসব বিষয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গেলে নিজেরাই) অপরাধী বনে যাবে। এরপর অনবরত সেই জিনিসগুলো আসতেই থাকবে,

আসতেই থাকবে। মোটকথা পরামর্শ নিবে এমন দুব্যক্তি (আলেম) থেকে, যাদের একজন হবে অক্ষম ও অন্যজন হবে অসৎ। একথার সমর্থন পাওয়া যায় হযরত জুন্দুব ইবনে আব্দুল্লাহ -এর বর্ণনা থেকে। তিনি বলেন,
আমরা আমাদের নবীজী (সা:) -এর সাথে ছিলাম। তাই আমরা কুরআন শিখার আগে ঈমান শিখেছি। তারপর আমরা কুরআন শিখেছি। আর এভাবে আমাদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের দেশ তথা সারা দুনিয়াতে হাজার হাজার মাদরাসায় লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে দ্বীনের কথা শিখছে। অথচ এদের অধিকাংশই তাদের পরিবার থেকে ইসলাম সম্পর্কে কোনো ধারণা না নিয়েই মাদরাসায় আসে। জন্মের পর থেকে ঈমানী কোনো সবক তার পিতা মাতা তাদেরকে হয়তো দেয় না বা দেওয়ার সামর্থ্য রাখে না। ফলে অনুপযুক্ত পাত্রে ঢেলে দেয়া হয় দ্বীনি পবিত্র সবক এবং তখন এদের অধিকাংশই এর মাহাত্ম্য বুঝতে ব্যর্থ হয়। মাদরাসার সার্টিফিকেট ধারী লোকদের সংখ্যা দিন

দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু আলেমরা দুনিয়া থেকে হারিয়ে যাচ্ছেন। একবার নবীজী (সাঃ) আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, ইলম তুলে নেয়ার সময় হয়ে গেছে। একথা শুনে এক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, ইলেম কিভাবে উঠে যাবে, অথচ আমরা নিজেরা কুরআন শিখছি এবং আমাদের সন্তানদেরকেও শিখাচ্ছি? তখন নবীজী (সাঃ) বললেন, আমি তোমাকে অনেক বুদ্ধিমান মনে করেছিলাম। ইহুদী-খ্রিস্টানরাও তো তাদের কিতাব পড়ে ও তাদের সন্তানদের পড়ায়। এতে তাদের কী ফায়দা হয়েছে?
একদা আব্দুল্লাহ (রাঃ) এক মজলিসে বসেছিলেন। তিনি বললেন, তখন তোমাদের অবস্থা কী হবে যখন ফিতনার চাদর তোমাদেরকে পরানো হবে? অল্প বয়সীরা সে সময় সীমা অতিক্রম করবে এবং বয়স্করা তখন দুর্বল হয়ে পড়বে। মানুষ সে সময় ফিতনাকে সুন্নত মনে করবে। আর সেই ফিতনাকে কেউ পরিবর্তন করতে চাইলে মানুষ তাকে বাধা দিয়ে বলবে, তুমি সুন্নতের মাঝে পরিবর্তন আনতে চাচ্ছ। তখন মজলিসের লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো, হে আবি আব্দুর রহমান, এ রকম কখন হবে? তিনি উত্তর করলেন, যখন তোমাদের মাঝে আলেমদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, কিন্তু তাদের মধ্যে বিশ্বস্তদের সংখ্যা হবে অনেক কম। যখন তোমাদের মাঝে দ্বীনের ব্যাপারে ফয়সালাকারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে কিন্তু তাদের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক লোকের দ্বীনের বুঝ থাকবে। আর যখন তোমরা আখেরাতের আমল দ্বারা দুনিয়ার সন্ধান করবে। আপনি যদি ইমাম মাহদি ও দাজ্জাল বিষয়ে

কোনো আলেমকে জিজ্ঞাসা করেন, অধিকাংশ আলেমই সম্ভবত জবাব দিবেন যে এগুলো নিয়ে এখন চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। এগুলো আরো অনেক বছর পরে হবে। আফসোস! কিয়ামতের আরো অনেক বছর বাকি আছে – এই কথার পক্ষে তাদের দলীল কোথায়? বরং কিয়ামতকে নিকটবর্তী মনে করাই সুন্নত এবং আমরা যে কিয়ামতের একেবারে নিকটবর্তী জামানায় বাস করছি, তার প্রমাণ হাদীসসমূহে মওজুদ আছে। নবীজী (সাঃ)-এর জামানাতে একটু ঝড়ো হাওয়া বইলেই সাহাবাগণ মনে করতেন কিয়ামত এসে গেলো কিনা। আজ চৌদ্দশত বছর পরের মুফতি সাহেবরা বলছেন, এগুলো এখনো অনেক দেরি আছে। আলেমদের মধ্যে এই অবস্থা আসল কিভাবে? একটু দেখুন.....

❖ মাদরাসায় সীমিত কিছু বিষয় পড়ানো হয়। দুইজন মুফতি সাহেবকে ইসলামের দাসদাসী প্রথা নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তারা জবাব দিয়েছে, এগুলো তাদের পড়ানো হয় না। বরং এগুলো নিয়ে ওস্তাদদেরকে জিজ্ঞাসা করলে তারাও বিষয়গুলো এড়িয়ে যান।

❀ এক হাদীসে নবীজী (সা:) এরশাদ ফরমান,

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيْئَةٍ

অর্থ : সকল ক্ষতির মূল কারণ হলো দুনিয়ার মহব্বত।

আরেক হাদীসে এসেছে, দুই জিনিস মানুষের ধ্বংসের কারণ। ১. দুনিয়ার মহব্বত এবং ২. অর্থের মহব্বত।

এই দুনিয়ার মহব্বত এতোই ক্ষতিকর যে, এর কারণে মানুষ দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পছন্দ করে। দ্বীন সম্পর্কে জানতে ইচ্ছে হয় না। দ্বীনি কিতাব অধ্যয়ন করাকে অপ্রয়োজনীয় মনে হয়। এমনকি আলেম সমাজও পর্যন্ত দ্বীনের সকল অংশ নিয়ে অধ্যয়ন করতে রাজি নয়। দ্বীনকে কেবল নামাজ - রোজা ও কিছু ইবাদাতের মধ্যে সীমিত করে ফেলা হয়েছে। সাহাবাওয়ালা জিন্দেগী অবলম্বন করাকে অসম্ভব মনে করা হয়। যুক্তি দেখানো হয়, এই জামানায় সাহাবাদের অনুসরণ করা যাবে না। আমাদের নিকটবর্তী আকাবিরদের অনুসরণ করতে হবে। এসব কথার দলীল কোথায়? অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

অর্থাৎ তোমরা সাহাবায়ে কেরামের মত ঈমান আন।
[সূরা বাকারা : ১৩]

একই সূরার আরেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

فان امنو ا بمثل ما امنتم به فقد اهتدو ا

অর্থাৎ এরা (মানুষেরা) যদি তোমাদের (সাহাবাদের) মত ঈমান আনত, তাহলে তারা অবশ্যই সঠিক পথ পেতো। [সূরা বাকারা : ১৩৭]

বর্তমানে আমরা মৃত্যুকে নিয়ে চিন্তা করতে রাজি নই। জিহাদের নাম শুনলেই মৃত্যুর ভয় পেয়ে বসে। ফলে যালেম শাসকের সামনে হক কথা বলার মত সাহস আর থাকে না। মৃত্যু এসে পড়ুক কিংবা কিয়ামত দ্রুত হয়ে যাক, নফস তখন এটা পছন্দ করে না। আমরা আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে সম্ভব এরকম সকল খায়েশ পূরণ করে ফেলি। আর যেটি সামর্থ্যের বাইরে সেটির জন্য আফসোস করি। নিজেদের দুর্গতির জন্য আমরাই দায়ী।

ইমাম আবু হানিফা (রহ:) ইলমকে বিভক্ত না করলেও পরবর্তীতে অধ্যয়নের সুবিধার জন্য এটিকে ইলমে আকাইদ, ইলমে ফিকাহ ও ইলমে তাসাউফ - এই তিন অংশে বিভক্ত করা হয়। ইলমে তাসাউফ প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে আইন, যা এই জামানা থেকে প্রায় উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইলমে আকাইদ ঐ সমস্ত জ্ঞানকে বলা হয় যার উপর বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে মুসলমানের ঈমান মজবুত হয়। আর ইলমে ফিকাহ বলতে সাধারণভাবে আমরা মনে করি ঐ সকল মাসআলা জানা যা বিভিন্ন আহকামের সাথে সম্পর্কিত এবং বর্তমানে আলেম বলতে আমরা তাদেরকেই বুঝি যারা বিভিন্ন আহকামের মাসআলা জানেন। কিন্তু আসলেই কি ব্যাপারটা এরকম? দ্বীনি ইলম হাসিল করা কি মাসআলা জানারই নাম মাত্র? সাধারণভাবে কোনো আলেমকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে, ইলমে ফিকাহ বলতে কী বুঝায়? তাহলে তাদের অধিকাংশই এ উত্তর দিবে যে, দ্বীন সম্পর্কিত সকল বিষয়ের মাসআলা সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করাকে ইলমে ফিকাহ বলে। অথচ ইমাম আবু হানিফা এরকম মনে করতেন না। তিনি বলেন, ইলমে ফিকাহ হলো ঐ ইলম যাতে মানুষ নিজের করণীয় কাজকে বুঝে নেয় এবং ঐ সকল কাজকেও বুঝে নেয় যা থেকে বেচে থাকা তার জন্য জরুরি। অর্থাৎ পাক-নাপাকি, নামাজ-রোজা ও হজ্জ-যাকাতের মাসআলা-মাসায়েল জানাকেই দ্বীন অনুধাবন করা বলা যাবে না। বরং দ্বীনের সত্যিকার অনুধাবন হলো একজন মুসলমান হিসেবে আমার প্রতিটি কথা ও কর্ম এবং যাবতীয় গতিবিধি কেমন হওয়া উচিত, দুনিয়ার এই হায়াতকে কীভাবে ব্যবহার করা উচিত। যখন আল্লাহ তা'আলার সামনে

হাশরের ময়দানে আমাকে দন্ডায়মান হতে হবে তখন আল্লাহ পাক যাতে আমার উপর নারাজ না থাকেন, এ চিন্তা যেন আমাকে মশগুল রাখে। যখন আমি আমার প্রতিটি কদম ফেলার আগে খেয়াল করি, এক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের কী হুকুম, নবীজী (সাঃ)-এর কী সুন্নত এবং সাহাবীদের কী উদাহরণ। দিলে এ অনুভূতি যার আসবে কেবলমাত্র সেই দ্বীন বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং কেবলমাত্র এ ব্যক্তিকেই আলেম বলা যাবে। হাদীসে আছে,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " بَدَأَ الإِسْلاَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

অর্থ: ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিলো, আবার খুব শীঘ্রই অপরিচিত হয়ে যাবে যেমন শুরুতে ছিলো। সুতরাং, সুসংবাদ অপরিচিতদের জন্য। [সহীহ মুসলিম, হাদীস-২০২]

ইসলামকে মানুষ চিনতো না। ইসলাম দুনিয়াতে বিস্তার লাভ করে সাহাবাদের কুরবানির বদৌলতে। সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহকে ভয় করতেন, যদিও তাদের সকলে বয়ান করতে জানতেন না বা ফতওয়া দিতে পারতেন না বা কুরআনের হাফেজ ছিলেন না। কিন্তু তারা অবশ্যই আলেম ছিলেন। তাদের মেহনত ও কুরবানির বিনিময়ে মদিনার ইসলাম যা সারা দুনিয়ার নিকট অপরিচিত ছিলো, তা সারা দুনিয়াতে পৌঁছে যায়।

⊠ হাদীসে এরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ إِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

অর্থ: নিশ্চয়ই আলেমগণ নবীদের ওয়ারিশ। আর নবীগণ ওয়ারিশদের জন্য দিনার বা দিরহাম রেখে যান না, বরং তারা ইলম রেখে যান। সুতরাং যে তা গ্রহণ করলো সে বড় সৌভাগ্য গ্রহণ করলো।

[সুনান আত তিরমিযী, ৫ম খন্ড, পৃ. ৪৮, হাদীস: ২৬৮২]

বর্তমানে প্রয়োজনীয় এলেমকে আগে শিক্ষা করানো হয়না বা গুরুত্ব দেয়া হয়না। মাদরাসায় কেবল আকীদার কিছু বিষয়, আরবী, উর্দু, ফারসী ভাষাতত্ত্ব, যের-যবর-পেশ ছাড়া এবারত পড়তে পারার যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ইলম শিখানো হয়। তাফসীর ও হাদীসের ছয় কিতাবের মাঝখান হতে কোনোমতে একবার নাযেরা পড়াতে পারলেই আপনি আলেম। কী শিখলেন, কী আমল করলেন কেমন মানসিকতা গড়ে উঠল, আল্লাহ-র ভয় কতটুকু পয়দা হলো, আল্লাহ-র মহব্বত কতটুকু পয়দা হলো, দুনিয়া কতটুকু ছাড়তে পারলেন, জিহাদ করতে পারবেন কিনা, মৃত্যুর ভয় দূর হলো কিনা, আখিরাতকে সামনে রেখে চলছেন কিনা,

উম্মাতের ফিকির এলো কিনা সেগুলো বিষয় নয়। পাশ করেছেন তাতেই আলেম হয়ে গেলেন। আলেমরা যদি কেবল মাসআলার ওয়ারিশ হয়ে থাকে, তাহলে নবীজী (সা:) -এর আখলাকের ওয়ারিশ কারা? নবীজী কি কেবল নামাজ-রোজা নিয়ে এসেছিলেন? শুধুই কি কুরআন তিলাওয়াত নিয়ে এসেছিলেন? সাহাবীদের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের প্রতিযোগিতা করে টাকা ও আন্তর্জাতিক পদক অর্জন করা শিক্ষা দিয়েছিলেন? মদিনার মসজিদে কেবল হালকার যিকির করা শিখিয়েছিলেন? সা'দ বিন হিশাম আয়েশা (রা:) কে প্রশ্ন করলেন, হে মু'মিনদের আম্মা, আমাকে নবীজীর আখলাক সম্পর্কে বলুন। আয়েশা (রা:) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি কুরআন পড়ো না? সা'দ বিন হিশাম বললেন হ্যা। তখন আয়েশা (রা:) বললেন, কুরআনই হলো নবীজী (সা:) - এর আখলাক। কুরআনই হলো সকল ইলমের উৎস। আর যারা নবীজীর পবিত্র জিন্দেগীকে নিজের জিন্দেগী বানাবে কেবল তারাই হলো নবীজী (সা:)-এর ওয়ারিশ। কেবলমাত্র তারাই আলেম।

কোনো এক মাহফিল সম্পর্কে একজন একটি কমেন্ট করেন সোশ্যাল মিডিয়াতে। কমেন্ট ছিল এরকম :

"হুজুর হেলিকপ্টারে উড়িয়া আমাদের মাহফিলে আসিলেন। মঞ্চে বসিয়া মধুর কণ্ঠে বয়ান করিলেন, নবীজী (সা:) কোনো দিন পেট ভরিয়া খানা খান নাই, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত যবের রুটিও পরপর দু'বেলা খেতে পান নাই, তার ঘরে একটানা তিন মাস পর্যন্ত রান্না করার মতো কিছুই থাকিতো না। এ সমস্ত বয়ান করিয়া হুজুর নিজেও খুব কাঁদিলেন, শ্রোতাদেরকেও খুব কাঁদাইলেন। বয়ান শেষ করিয়া হুজুর ভুনাখাসী, মুরগীর রোস্ট, গরুর গোস্ত ও রুই মাছ দ্বারা কয়েক প্লেট পোলাও খাইলেন। তারপর এক লক্ষ টাকা পকেটে" লইয়া হেলিকপ্টারে চড়িয়া উড়িয়া চলিয়া গেলেন।

এরকম দুনিয়াদার আলেমদের অবস্থা দেখেই হয়তো সাধারণ মানুষ আলেমদের উপর আস্থা রাখতে পারে না। যারা দ্বীন বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করে চলেছে তারা কী করে আলেম হয়? আর মুসলমানের উপর আযাব কেনো আসবে না? উমর (রা:) বলেন, এ উম্মতের উপর মুনাফেক আলেমদের ব্যাপারে আমার সবচেয়ে বেশি ভয় হয়। একজন জিজ্ঞাসা করলো, মুনাফেক আলেম কারা? তিনি বললেন, মুখে আলেম কিন্তু দিল ও আমলের হিসাবে জাহেল। উমর (রা:) আরো বলেন, যে আলেমকে দুনিয়ার সাথে মহব্বত করতে দেখো, ধরে নিবে যে, তার দ্বীন ত্রুটিযুক্ত।

কেননা যে যেই জিনিসের প্রতি মহব্বত রাখে তার মধ্যেই সে প্রবেশ করে।

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى
مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ، وَمِنَ
الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، مَسَاجِدُهُمْ
يَوْمَئِذٍ عَامِرَةٌ وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ
الْهُدَى، عُلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَدِيمِ
السَّمَاءِ، مِنْهُمْ خَرَجَتِ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ
تَعُودُ

[তাফসীরে কুরতুবী, খন্ড-১২, পৃষ্ঠা-২৮০]

অর্থ: মানুষের উপর এমন একটি জামানা আসবে, যখন ইসলামের নাম ব্যতীত কিছুই বাকী থাকবে না। কুরআনের অংকিত হরফ ব্যতীত কিছুই বাকী থাকবে না। মাসজিদগুলো সুসজ্জিত থাকবে, কিন্তু সেখানে হেদায়াত থাকবে না। তখনকার আলেমরা আসমানের ছায়ার নিচের নিকৃষ্টতম বান্দা হবে। এদের থেকেই ফিৎনা ছড়াবে এবং সেই ফিৎনাতে নিজেরাই পতিত হবে।

বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য আলেম; হেফাজতে ইসলামের মঞ্চেও থাকেন আবার টঙ্গী ইজতেমার মঞ্চেও ছিলেন। ইমাম মাহদির তার সাথে দেখা হয়েছিল। যখনই দেখা হয়েছে, তাকে কখনো এক জামা দ্বিতীয় বার ব্যবহার করতে দেখেছেন বলে ইমাম মাহদির মনে পড়ে না। ইমাম মাহদি তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন তাঁর পাঞ্জাবী কতগুলো। তিনি একটু আনন্দ বা গর্ব করেই বললেন, হিসাব নেই। কমপক্ষে ৪০-৫০ টা হবে। ইমাম মাহদি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, এটি আমার নবীর সুন্নতের মধ্যে পড়ে কিনা। তিনি বললেন, এখন কি আগের জমানা আছে? এখন ঐ জমানা যে, আলেমরা প্রাডো গাড়িতে করে ঘুরবে, হাতে থাকবে আইফোন। তারপর তাঁর হাতের ঘড়িটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, এ রকম ঘড়ি থাকবে হাতে যার মূল্য দেড় লক্ষ টাকা।

সাঈদ বিন জুবাইর (রাঃ) -কে কেউ জিজ্ঞাসা করলো, হে আবু আব্দুল্লাহ। মানুষের ধ্বংস হবার আলামত কী? তিনি বললেন, তাদের আলেম সমাজ ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

শায়েখ হাতেম (রহঃ) একবার হজ্জসফরে এক এলাকায় খবর পান যে, ঐ এলাকার সবচেয়ে বড় আলেম কাজি শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল অসুস্থ। খবর পেয়ে তিনি স্থানীয় এক ব্যবসায়ীকে সাথে নিয়ে তাকে দেখতে গেলেন। কাজি সাহেবের বাড়িতে পৌঁছে শায়েখ হাতেম স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কাজি সাহেবের বাড়ি এক বিশাল মহল!

ব্যাপারটা তার ভালো লাগল না। একজন আলেম বিনা মহলে বাস করেন। তিনি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি চাইলে তাকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হলো। ভিতরের অবস্থা দেখেও হাতেম সাহেবের মন খারাপ হয়ে গেল। সেখানেও এক আলিসান অবস্থা এবং কাজি সাহেব গোলামদের ভিড়ের মাঝে শুয়ে আছেন। শায়েখ হাতেম তখন জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি ইলম কার নিকট হতে শিখেছেন? তিনি বললেন, নির্ভরযোগ্য আলেমদের নিকট হতে। শায়েখ হাতেম আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সেই আলেমগণ কার নিকট হতে ইলম শিখেছেন? তিনি বললেন সাহাবায়ে কেরাম হতে। এক পর্যায়ে শায়েখ হাতেম বললেন সেই ইলমের কোথাও কী এ কথা বর্ণিত হয়েছে, যে ব্যক্তির বাড়ি যত উঁচু ও বড় হবে তার মর্যাদা আল্লাহ পাকের নিকট সে রকম উঁচু হবে? কাজি সাহেব বললেন, না, এ কথা সেই ইলমের মধ্যে নেই। শায়েখ হাতেম জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনি কার অনুসরণ করছেন? নবীজী (সা:)-কে? নবীজী (সা:)-এর সাহাবায়ে কেরামকে? মুত্তাকী লোমায়ে কেরামকে? নাকি ফিরআউন ও নমরুদদেরকে? ওহে মন্দ আলেমের দল! আপনাদের মতো লোকদেরকে দেখে জাহেল দুনিয়াদাররা যারা দুনিয়ার নেশায় মত্ত, তারা এ কথা বলে যে, যখন আলেমদের এ অবস্থা তখন আমরা তো তাদের চেয়ে বেশি খারাপ হবোই।

ইমাম মাহদির নাম ও আবির্ভাবের সময়

مشتق محمد ارمان خان

مشتق : $100+400+300+40 = 840$
$= 8+4+0 = 12$

مشتق অর্থ উদ্ভূত। অর্থাৎ এর একটি উৎস আছে।

المهدى من عترتى من ولد فاطمة

অর্থ : আল মাহদি আমার পরিবারের, ফাতিমার সন্তানদের মধ্য থেকে। [সুনান আবু দাউদ, হাদিস নং- ৪২৮৪]

যদি হাদীসে বর্ণিত ولد فاطمة -এর মানটা দেখা যায়,

ولد فاطمة : $400+40+9+1+80+4+30$
$+6 = 570 = 5+7+0 = 12$

তাহলে তা আসে ১২ যা কিনা مشتق এর সমান।

محمد : $4+40+8+40 = 92 = 9+2 = 11$

ارمان : $50+1+40+200+1 = 292 =$
$2+9+2 = 13$

انى جاعل فى الارض خليفة

অর্থ : নিশ্চয়ই আমি জমিনে খলিফা প্রেরণ করবো।

[সূরা বাকারাহ, আয়াত-৩০]

অর্থাৎ, জমিনে خَلِيْفَةٌ প্রেরণ করা হলো আল্লাহ তা'আলার আমানত। ازمان। যাকের অর্থ হলো আমানত।

خَلِيْفَةٌ : 400 + 80 + 10 + 30 + 600
= 1120 = 1 + 1 + 2 + 0 = 11 + 2
= 13

দেখা যাচ্ছে خَلِيْفَةٌ এবং ازمان এর মান সমান।

خان : 50 + 1 + 600 = 651 = 6 + 5 + 1 = 12

ব্রিটিশ আমলে যে সমস্ত জায়গীর রাজা-বাদশাহদের নিয়োগ দেয়া হত তন্মধ্যে মুসলিম রাজাদের خان উপাধি দেয়া হয়েছিল। তাহলে خان মানে হলো বাদশাহ। আর اللّٰه হলেন সকল বাদশাহের বাদশাহ। الله এবং خان এর মান সমান।

اللّٰه : 1 + 30 + 30 + 5 = 66 = 6 + 6 = 12

খেয়াল করে দেখুন। নামটির একটি সুন্দর অর্থ আসে।

خان ازمان محمد مشتق
اللّٰه خَلِيْفَةٌ محمد ولد فاطمة

ফাতিমা রদিয়াল্লাহু আনহার সন্তান, মুহাম্মাদ, আল্লাহ'র খলিফা।

چون سال بهشتی از کان زهو قاید
مهدی خروج سازد در مهد مهد یانه

অর্থ: কানা যাহুকার প্রকাশ ঘটার সালেই প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদি দুনিয়ার বুকে হবেন আবির্ভূত।
[ক্বাসীদায়ে শাহ নিয়ামতিউল্লাহ]

পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাইলের ৮১ নং আয়াতে উল্লেখ আছে এই كان زهوقا -র। যদি আবযাদ মানটা দেখা যায়,

كَانَ : 50+1+20 = 71 = 7+1 = 8

زَهُوقًا : 1+100+6+5+7 = 119 = 1+1+9 = 11

كان زهوقا : 8+11 = 19

মুশাতাক মুহাম্মাদ আরমান খান জন্মগ্রহণ করেন 30 মে ১৯৮১ ইসায়ী সালে। আর,
১৯৮১ = ১+৯+৮+১ = ১৯। তাহলে দেখা যাচ্ছে ইমাম মাহদি ১৯৮১ সালেই দুনিয়াতে আবির্ভূত হয়েছেন যা ক্বাসীদা দ্বারা সমর্থিত।

পূর্ব মানে পূর্বই

কেয়ামতের আলামতসমূহের উপর লিখা আরব বিশ্বে সর্বাধিক পঠিত কিতাব হচ্ছে ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আল-আরিফি সাহেবের লিখিত কিতাব "THE END OF THE WORLD" কিতাবটি। এ কিতাবে লেখক একাধিকবার ইবনে কাছীর (রহ.) - এর মতটিকে তুলে ধরেছেন এবং ইমাম মাহদীর মদীনায় জন্মগ্রহণ করার বিষয়টি তিনি এড়িয়ে গেছেন। যেমন তিনি ২৪৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন, ইবনে কাছীর (রহ.) বলেন - "প্রকৃত মাহদী প্রাচ্য থেকে আত্মপ্রকাশ করবেন। ছামারার ভূ-গর্ভস্থ কক্ষ থেকে নয়। যেমনটি রাফেযী সম্প্রদায় মনে করে থাকে। ....."

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, ইমাম মাহদী সংক্রান্ত হাদীসগুলো মাদানী হাদিস। কেননা হযরত হাসান (রা.) এবং হযরত হুসাইন (রা.) - এর জন্ম মদীনায়। যারা অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ সম্পর্কে ধারণা রাখেন, তারা হয়তো অবাক হবেন। মদীনার অক্ষাংশ = ২৪.৪৭০৭০১° উত্তর এবং হযরত যেই শহরে জন্মগ্রহণ করেছেন তার অক্ষাংশ হলো = ২৪.৪৮° উত্তর। মদীনা থেকে সরলরেখা বরাবর সোজা পূর্বদিকে একই অক্ষরেখার উপর অবস্থিত আরমান খানের জন্মস্থান। অর্থাৎ, পূর্ব মানে পূর্বই।

তাহলে ইলম কি?

ইলমের হাকীকত : হযরত ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, অধিক পরিমাণে বয়ান-বর্ণনা করতে পারার নাম ইলম নয়, বরং প্রকৃত পক্ষে ইলম হলো একটি নূর যা মহান আল্লাহ মানুষের অন্তরে অবতীর্ণ করে থাকেন।

মেশকাতুল মাসাবীহ শরীফে বর্ণিত আছে — হাসান (রা) হতে বর্ণিত রয়েছে, ইলম দু'প্রকার। যথা — ইলমে তাসাউফ এতেই উপকার লাভ হবে। দ্বিতীয় প্রকারের ইলম, তা হলো ইলমুল্লিছান বা মৌখিক ইলম অর্থাৎ যা শুধুমাত্র শিক্ষা করা হয়েছে। এ মানুষের উপর আল্লাহ তা'আলার দলীল স্বরূপ হবে। শরীয়ত যথার্থরূপে প্রতিপালন করতে না পারলে মারেফত লাভ হয় না। মারেফত শিক্ষা না করতে পারলে শরীয়ত যথার্থরূপে আদায় হয় না। উভয়কে সংরক্ষণের জন্য উভয়ের দরকার। ইমাম মালেক (রহ.) লিখেছেন, যে ব্যক্তি শুধু ফিকাহ শিক্ষা করেছে কিন্তু তাসাউফ শিক্ষা করেনি সে ব্যক্তি ফাসেক। হযরত মোজাদ্দেদে আলফেসানি সাহেবের মকতুবাতে ইমাম বুখারী নামক কিতাবে লিখিত আছে — হযরত রাসূলে করীম (সা.) বলেছেন, আলেমগণ পয়গাম্বরগণের উত্তরাধিকারী। অর্থাৎ — আম্বিয়াগণ যে ইলম পৃথিবীতে রেখে গেছেন, ওটা দু'ভাগে বিভক্ত। প্রথম : ইলমে শরীয়ত বা বাহ্যিক জ্ঞান; দ্বিতীয় : ইলমে আসরার বা তত্ত্ব-জ্ঞান। যিনি মাত্র এক প্রকারের ইলমের অধিকারী হয়েছেন তিনি পয়গাম্বরের যথার্থ ওয়ারেস নন। যেহেতু পরিত্যক্ত সম্পত্তির যাবতীয় বিভাগ হতে অংশাধিকারী হওয়াকেই ওয়ারেস বলে। আর যিনি পরিত্যক্ত সম্পত্তির কোন নির্দিষ্ট অংশ পাবার অধিকারী হবেন তিনি গরীব বা সম্পত্তি বিশেষে আংশিক অধিকারী মাত্র।

আল্লাহ-র রাসূল (সাঃ) বলেছেন — "আমার আলেম উম্মতবৃন্দ ইস্রাইলে বংশীয় ধর্মসম্প্রদায়ের সদৃশ।" এ হাদীসের মর্মেও বহুবিধ ইলমের অধিকারীগণকেই আলেম বলে নির্দেশ করা হয়েছে। যারা কোন এক বিষয় মাত্র লাভ করেছেন তা তারা নয়। এ প্রকার অভিমত হযরত কেরামত আলী মরহুম সাহেব তার "কওলুচ্ছাবিত" নামক কিতাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। মাওলানা মরহুম সাহেব উক্তি "জাদুত্তাকওয়া" নামক কিতাবে হাদীসে জিবরাইলে (আঃ) -এর মর্মে লিখেছেন — ইসলাম, ঈমান ও ইহসান, এ তিনটি মিলে দ্বীন বা শরীয়ত। তিনি আরও লিখেছেন যে, তাসাউফ, ফিকাহ এবং আকাইদ প্রভৃতি সমাধানের জন্য এবং এর যথার্থরূপে প্রতিপালনের জন্য একটি অন্যটির দিকে বিশেষভাবে মুখাপেক্ষী। এর মূলে একটি হতে অপরটি ভিন্ন এবং একটি ছাড়া অন্যটি পূর্ণ হতে পারে না।

انما يخشى الله من عباده العلماء

অর্থ : নিশ্চয়ই আল্লাহ পাকের বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে। [৩৫ সূরা ফাতির : ২৮]

এ পবিত্র আয়াত শরীফে যে 'উলামা' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তা সাধারণত যে অর্থে উলামা শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সে অর্থবোধক নয়। যারা কিতাব পড়ে বিদ্যার্জন করেছেন তারা কুরআনের বর্ণিত 'আলেম' পদবাচ্য হতে পারবেন না। বরং যারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মহিমায় জাত ও অসীম গৌরবমন্ডিত গুণাবলীকে ইমান ও জ্ঞান-গবেষণার উজ্জ্বল আলোকে চক্ষিতে অবলোকন করেছেন, তারাই প্রকৃত আলেম নামের যোগ্য। আয়াতটির ব্যাখ্যায় তফসীরে ইবনে কাসিরে লিখিত আছে — আবি মাসউদ (রা.) বলেছেন, "বহু সংখ্যক হাদীস জানলে সে ব্যক্তি আলেম হয় না। বরং যার মধ্যে খোদাভীতি অধিক, সে ব্যক্তিই আলেম।" আহমদ ইবনে সালেহ মিসরী বলেছেন — অধিক রেওয়ায়েত শিক্ষা করলে ইলম অধিক হয় না। ইলম একটি নূর। এটা আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তঃকরণে দান করেন। দেখুন, আলেমগণ তিন ভাগে বিভক্ত। আলেম বিল্লাহ, আলেম বি-আমরিল্লাহ এবং উভয়টি। যারা শুধু আলেম বিল্লাহ তারা শুধুমাত্র আল্লাহকেই জানেন কিন্তু আদেশ-নিষেধ জানেন না। যারা আলেম বি-আমরিল্লাহ তারা শুধু আদেশ-নিষেধ জানেন কিন্তু আল্লাহকে ভয় করেন না। সেই শ্রেণীর আলেমই প্রকৃত আলেম যারা একই সাথে আলেম বিল্লাহ ও আলেম বি-আমরিল্লাহ অর্থাৎ যারা আল্লাহ-র আদেশ-নিষেধ জানেন এবং আল্লাহকে ভয়ও করেন।

এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে বর্তমান যামানায় সার্টিফিকেটওয়ালা ওলামারা নিজের মধ্যে আল্লাহ'র ভয় আছে বলে দাবী করেন। যেহেতু আল্লাহ বলেছেন, আলেমরাই আমাকে ভয় করে আর আমি যেহেতু আলেম হয়েছি, তাই আমি আল্লাহকে ভয় করি। বাহ! কি যুক্তি! ভয়ের প্রকৃত স্বরূপ কী? অনেকেই মনে করেন, আল্লাহ তা'আলার 'বড়ত্ব ও প্রতাপ' স্মরণের ফলে দীলের মাঝে যে অবস্থা উৎপন্ন হয়, তাকে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় বলে। না, এটি মোটেও ভয়ের সংজ্ঞা নয়। আল্লাহ'র ভয় বা তাকওয়ার প্রকৃত সংজ্ঞা হলো - 'আল্লাহ তা'আলার বড়ত্ব ও প্রতাপ স্মরণের ফলে দীলের মাঝে উৎপন্ন অবস্থার কারণে যদি আল্লাহর নাফরমানী ছেড়ে দেয়া হয় এবং তাঁর হুকুম - আহকাম মানতে নিজেকে বাধ্য করা হয়, তবেই তাকে আল্লাহর ভয় বা তাকওয়া বলা হবে।' তো, আমার মধ্যে ভয় পয়দা হয়েছে কিনা বুঝব কিভাবে? আমার ভিতর ভয় পয়দা হওয়ার আলামত কি এটি যে, আমি মাদরাসায় পড়ে সার্টিফিকেট লাভ করেছি। না, কক্ষণো না। ভালো করে বুঝে নিন, "ভয়" দাবী করার বিষয় নয়, প্রমাণ করার বিষয়। সেই ভয় তো ভয় নয়, যেই ভয় আমাকে গুনাহ থেকে বাচায় না, দুনিয়া ছাড়তে বাধ্য করে না, শেষ পরিণতির চিন্তায় অস্থির করে তুলে না, দুনিয়ার মহব্বত দূর করে না, হক্ব কথা বলার সাহস যোগায় না, জিহাদের ময়দানে নিয়ে যায় না।

ইলম হাসিলের তরীকা

হযরত ইমাম গাযযালি (রহ:) বলেন, দিন-রাত্রির মধ্যে একবারের বেশি আহার করা সঙ্গত নয়। দুই দিনে এক সন্ধ্যা আহার করাই পূর্ণ বৈরাগ্য (যুহদ)। একদিনে দুইবার আহার করলে বৈরাগ্য থাকে না। সে ব্যক্তি ইলমের নূর পাবে না, যে তিনদিনের কম সময় পর পর পানাহার করে। [এহইয়াউ উলুম, কিমিআয়ে সাআদাত]

নফসকে কাহিল করার উপায় হলো এটাকে ভুখা রাখতে হবে। যত বেশি এটাকে ভুখা রাখা যাবে এটা তত বেশি নিস্তেজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। তখন এর মধ্যে আনুগত্য পয়দা হবে। আজ মুসলিমরা রকমারি মজাদার খাবার খেয়ে খেয়ে নফসকে খুব শক্তিশালী করে ফেলেছে। তাই সারা দুনিয়ার মুসলিম আজ এতো গুনাহে লিপ্ত ও দ্বীন থেকে দূরে। এ কারণেই মুসলিমরা দুনিয়াতে অত্যাচারিত হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ-র সাহায্য থেকে দূরে। এক সাহাবি থেকে বর্ণিত নবীজী (সা.) ফজরের নামাজ শেষে ঘরে এসে ব্রেকফাস্ট খেলেন, সকাল ১০টার দিকে বনু হাশিম গোত্রের কয়েকজন লোক নবীজী (সা.)-র সাথে দেখা করতে আসলে তাদেরকে তিনি মেহমানদারি করলেন এবং তাদের সাথে তিনিও হালকা নাস্তা করলেন। তারপর দুপুরে লাঞ্চ করলেন, বিকালে একটু ক্ষুধা অনুভূত হতেই কিছু চা-নাস্তা খেলেন এবং ইশার নামাজের পর ডিনার করে বিছানায় গেলেন। . . . .

– হা হা হা! এই রকম হাদীস কোথায় আছে? আমরা যে তিন বেলা খানা খাই, কুরআন বা হাদীসের কোথায় এই নিয়ম লেখা আছে?

আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাবীব (সা.)-কে দিনের পর দিন না খাইয়ে রাখতেন অকারণে নয়। অকারণে সাহাবায়ে কেরাম ভুখা দিন পার করতেন না। এটা এক আত্মিশুদ্ধান আমল, যা যমিন থেকে হারিয়ে গেছে। ভুখা থাকার দ্বারা আল্লাহ রূহে ও শরীরে শক্তি দান করেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আয়েশা (রা.)-কে বলেছিলেন, "হে আয়েশা! তুমি দিনে একবারের বেশি আহার করো না, দিনে একবারের বেশি আহার করা অপচয়।" শয়তানী স্লোগান চলছে যে, উম্মত এখন দুর্বল, তাই কম খেয়ে সাধনা করা যাবে না। বেশি বেশি খেয়ে বেশি বেশি দ্বীনি কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাতের পর প্রথম যে বিদআত চালু হয়েছে, তা হলো পেট ভরে আহার করা। বর্তমান সময়ে কোন্ আলেম আছেন, যিনি দুইবেলা বা তিনবেলা পেট ভরে আহার করাকে বিদআত মনে করেন? অথচ হাদীসে এসেছে, "সকল বিদআতই পথভ্রষ্টতা।" এজন্যই আজ যমিন থেকে ইলম উঠিয়ে নেয়া হয়েছে। মাদরাসার শিক্ষকরা তা মানুন বা না মানুন। এটা আর যাই হোক, নবুয়তের যামানার ইলম নয়। আহ!

তাহলে জেনে রাখুন

ভুখা থাকা ইলম হাসিলের শর্ত

আসহাবে সুফফার সাহাবী রদিয়াল্লাহু আনহুম দিনের পর দিন ক্ষুধার্ত থেকে দ্বীন শিখেছেন। হাদীসের ইমাম আবু হুরাইরা ভুখা থাকতে থাকতে বেহুঁশ হয়ে পড়ে যেতেন। লোকেরা তাকে পাগল মনে করে ঘাড়ে পদাঘাত করত। ভুখা থাকার দ্বারা রুহানি শক্তির সাথে সাথে অনেক ইলম হাসিল হবে। কুরআন, হাদীসের অন্তর্নিহিত অর্থ ও তাৎপর্যসমূহ প্রকাশ পাবে। ভুখা অবস্থায় তাহাজ্জুদ নামায আদায় করে রাতের শেষাংশে তিলাওয়াত করবে। এতে করে কাশফ হাসিল হবে এবং গায়েবের এমনসব জিনিস নজরে ভাসবে যা ঈমানের খাদ্য দিবে ইনশাআল্লাহ। এভাবে আস্তে আস্তে মা'রিফাত হাসিল হবে। যারা বিদআতি ও শয়তানের ভাই তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা কিভাবে পথ প্রদর্শন করবেন? ইলমের নূর কিভাবে দিবেন? ইলম তো আর কিছু বাক্য ও শব্দের ভান্ডার নয়, প্রকৃত ইলম হলো দ্বীনের উপলব্ধি। যে ইলম আমাদের জিন্দেগীকে সাহাবাওয়ালা জিন্দেগী বানায় না, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করে দেয় না, তা মোটেও ইলম নয়, বরং জাহিলিয়াত। আপনি যত বড় মাদ্রাসা থেকে ফারেগ হোন না কেন, আপনার জন্যেও একই কথা। খুব ভাল করে বুঝে নিন — ইলম হলো আল্লাহ-র পরিচয় (মারিফাত) লাভের মাধ্যম। সেই ইলমই প্রকৃত ইলম যা মুমিনের অন্তরে আল্লাহ এবং আল্লাহ'র রাহে ক্বিতাল করাকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসতে শিখায়। সেই ইলমই প্রকৃত ইলম যা দীল থেকে গাইরুল্লাহ-র ভয় দূর করে এক আল্লাহ'র ভয় তৈরী করে দেয়।

সেই ইলমই প্রকৃত ইলম যা দীলের মাঝে দুনিয়ার হাকীকত পয়দা করে দেয়, দুনিয়া ছাড়তে বাধ্য করে, আখিরাতের স্মরণ পয়দা করে, আখিরাতের প্রতি আগ্রহী করে এবং মৃত্যুর ভয় দূর করে।

ক্ষুধার্ত থাকার উপকারিতা :

* আত্মা নির্মল এবং উজ্জ্বল হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে পেট ভরে খাওয়ার দ্বারা আত্মা অন্ধ এবং মেধাশক্তি অকর্মণ্য হয়ে উঠে।

* হৃদয় হালকা হয়, ফলে যিকির এবং মুনাজাতের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়।

* ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করলে অহংকার এবং গাফলতি দূর হয়।

* ক্ষুধার্ত থাকলে ঘুম কম হয়, মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়, মেধা তীক্ষ্ণ হয়, দূরদর্শিতা বৃদ্ধি পায়।

* কম পানাহার করলে অসুখ-বিসুখ হতে হেফাযত থাকা যায়। যেমন — গ্যাসের সমস্যা, গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা, ডায়াবেটিস, উচ্চ-রক্তচাপ, হার্ট অ্যাটাক, স্থূলতাজনিত রোগ, কোমর ব্যথা, পিঠ ব্যথা, হাঁটু ব্যথা ইত্যাদি।

* নফস দুর্বল হয়ে অনুগত হয়ে যায়।

ইমাম মাহদিকে কেন চিনতে পারছেন না বলব?

আপনার কী মনে হয়? আমি বলব যে, আপনি এই হাদীস জানেন না, ওই ক্বাঈদা জানেন না এইজন্য ইমাম মাহদি কে চিনতে পারছেন না? জ্বী না। আপনার সমস্যা সম্ভবত অন্য জায়গায়। আপনি সকল ইমাম মাহদি সংক্রান্ত হাদীস জেনে ফেললেও, আপনি পুরো ক্বাঈদা মুখস্ত করে ফেললেও ইমাম মাহদিকে চিনতে পারবেন না। জানা এক জিনিস আর বুঝা এক জিনিস। যারা মু'জিযা প্রকাশ পাওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ-র রাসূলকে অস্বীকার করেছিল তারা তা কেন করেছিল? আল্লাহ-র মু'জিযা কি যথেষ্ট কনভিন্সিং ছিল না? আসলেই কি তারা বুঝে নি, নাকি ব্যাপার অন্য কিছু? ব্যাপার আসলে অন্য কিছু ছিল। সমস্যা তো অনেক। কিন্তু, দুইটা সমস্যাই সম্ভবত সবচেয়ে বড়। বলি আপনাকে,

মানুষ যখন কোনো ফিতনাতে অভ্যস্থ থাকে, সে সেই ফিতনাকে মহব্বত করে বিধায় তাতে আসক্ত থাকে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চায় না। কেউ তাকে সঠিক রাস্তা দেখাতে চাইলে তাকে সে শত্রু মনে করে।

হযরত হুজাইফা (রাঃ) বলেন, আমি যা জানি তা যদি তোমাদের সামনে বর্ণনা করি, তাহলে তোমরা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। একভাগ আমাকে কতল করবে, একভাগ আমাকে কোনো সাহায্য করবে না এবং একভাগ আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

নিজে তো জানেন আপনার মধ্যে এই ব্যাধি আছে কি না।

والعاجز من اتبع نفسه
هواها وتمنى على الله

নবীজি (সাঃ) এরশাদ ফরমান, বেওকুফ ঐ ব্যক্তি যে তার নফসের খাহেশের অনুসরণ করে, আবার আল্লাহ্ পাকের দরবারে আশা করে।

[সুনান আত তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, হাদীস - ২৪৫৯]

আপনি আপনার খাহেশ পূরণ করবেন আবার আল্লাহ -র কাছেও চাইবেন! কী আশ্চর্য! আপনি তো বেওকুফ। আপনি যে-ই হোন, হাদীস মোতাবেক আপনি একটা বেওকুফ। আপনি সম্ভবত জীবনেও পথ পাবেন না। আর একই কারণে আমাদের দু'আও কবুল হয় না। আপনি ৫ বেলা খাওয়া-দাওয়া করবেন, সস্তা মূল্যে নিজের দ্বীন বিক্রি করবেন আবার আল্লাহ'র খিলাফাকে চিনতে পারবেন এটা কীভাবে সম্ভব? আপনার সব কাজে আদেশ থাকে নামাজ, রোযা আর মিষ্টির সুন্নত শিক্ষা করা পর্যন্ত। কখনও জিহাদের দাওয়াত দিয়েছেন? কখনও মানুষকে বলেছেন যে আল্লাহ'র রাসূলের ঘরে ওফাতের সময় আগুন জ্বালানোর তেল না থাকলেও কিন্তু তলোয়ার ঝুলানো ছিল চারটি। একটি নয়, দু'টি নয়।

আরও বলব?

আপনার অসৎ কাজে শুধু নিষেধ-ই, বাধা প্রদান আর হয়না। আপনি মানুষকে শুধু নামাজ ছাড়তে নিষেধ করেন, রোজা ছাড়তে নিষেধ করেন। কখনও হাসিনার রিদ্দা নিয়ে মুখ খুলেছেন? অভিশপ্ত আসাবিয়্যাত যে আমাদের গিলে খেল তা বলেন? গণতন্ত্র যে একটি শিরকি ব্যবস্থা তা বলেন? বলবেন কী? আপনি কী এগুলো আদৌ জানেন? যারা দিনরাত টাকার ধান্দা করে, দুনিয়া কামাই করার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, কুরআন শরীফ শিক্ষা দিয়েও বিনিময় গ্রহণ করে (মা'আযাল্লাহ), হালাল-হারামের মাঝে কোনো বাছ বিচার করে না, ঐক্যবদ্ধ হতে চায় না, ঐক্যবদ্ধ হতে দেয়না, ঝগড়াঝাটি করে এদেরকে আল্লাহ তা'আলা কীভাবে সহীহ বুঝ দিবেন? এরা কিভাবে সঠিক পথ খুঁজে পাবে? এরকম মানুষদের পথ দেখানো কী আল্লাহ'র সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত? এদের ফাহিশা কাজে ডোপামিন নিঃসরণ হতে পারে, কিন্তু হেদায়াত প্রাপ্তি হয়তো এতোটা সহজ হবে না। আপনার কতটা সমস্যার কথা বলব? আজ সারা দুনিয়ায় উম্মত মার খাচ্ছে সেদিকে আপনার খেয়াল নেই, আপনি ধান্দাবাজি করছেন কে আপনার চেয়ে বেশি দুনিয়া পেল। এজন্য আপনি ব্যথিত হচ্ছেন। অমুকে গাড়ি-বাড়ি করে ফেলেছে, আপনি করতে পারলেন না। আল্লাহ তা'আলা তাঁর অফুরন্ত ভান্ডার থেকে যখন কোনো বান্দাকে ইলম, সম্পদ, মান-মর্যাদা বা অন্য কোনো নিয়ামত দান করেন, তখন আপনার ভাল লাগে না। আপনি চান যে, তাদের নেয়ামত যদি ধ্বংস হয়ে যেত। আপনি তো একটা হিংসুক। হিংসা করার দ্বারা আপনি মূলত আল্লাহর ফয়সালাকেই অপছন্দ করলেন।

আমরা যদি সত্যিকার অর্থে বিচার করি, তাহলে দেখতে পাব যে, দ্বীনি প্রতিটি কাজকর্মে, ইলাহী মেহনতে, ইবাদাতে, ইলমী ময়দানে, দাওয়াতের ময়দানে, জিহাদের ময়দানে, দান - খয়রাত ইত্যাদি ক্ষেত্রে রিয়া বা লোক দেখানো মনোবৃত্তি আমাদের মাঝে কাজ করছে। এ মনোবৃত্তি আমাদের সকল ইবাদাতগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। রিয়া মূলত: গোপন শিরক, যা মুসলিমরা করে থাকে। আর প্রকাশ্য শিরক হলো মূর্তিপূজা। আফসোস! একই রক্ত - মাংসের মানুষ আল্লাহকে না দেখিয়ে অপর মানুষকে নিজের সাধুতা দেখাতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায়। আমাদের ইবাদাতগুলি যে রিয়ায় ভরপুর তার কিছু লক্ষণ হলো —

> যদি কেউ আমাকে সালাম না দেয়, তাহলে কষ্ট অনুভূত হয়।

> আমাকে যদি জামাতের আমীর না বানানো হয়, তাহলে মনে ব্যথা লাগে।

> আমি ভাল বয়ান করতে পারি, কিন্তু আমাকে বয়ান করতে না দিলে আমার দীলের মধ্যে চোট লাগে।

> আমার সামনে যদি আমার সাথীর প্রশংসা করা হয় আর আমার প্রশংসা না করা হয়, তাহলে আমার কেমন জানি লাগে।

> আমি আজকের অভিযানে এত কষ্ট করলাম, এত বীরত্ব দেখালাম। কিন্তু কেউ একটিবারের জন্যও আমার কথা আলোচনা করল না।

> আমি মজলিসে আসলাম কিন্তু কেউ আমাকে দেখে দাঁড়াল না। তাই খারাপ লাগল।
> আমি এতটাকা দান করলাম কিন্তু আমার নাম মাইকে ঘোষণা করা হলো না। মনে আঘাত পেলাম।
> এত টাকা খরচ করে হজ্জ করে আসলাম কিন্তু কেউ আমাকে হাজী বলে না। তাই কষ্ট পেলাম।

নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি উটের রশি পাওয়ার আশায় যুদ্ধে যোগদান করে, তার কপালে রশি ছাড়া আর কিছুই নাই।

আমাদের আরেক ধ্বংসাত্মক ব্যাধির নাম অহংকার। এই রোগে আক্রান্ত রোগী নিজেকে আত্মগৌরব ও আত্মম্ভরিতার দৃষ্টিতে দেখে এবং অপরকে হীন ও অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। এর ফলে সে আমি...... আমি...... প্রলাপ বকতে থাকে। যেমন বলেছিল অভিশপ্ত ইবলিস। পবিত্র কুরআনের ভাষায়,

انا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين

[০৭ সূরা আরাফ : ১২]

আমি তার চেয়ে ভাল, আমাকে তুমি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ, আর তাকে সৃষ্টি করেছ মাটি থেকে।

উক্ত ব্যাধির ফলশ্রুতিতে সমাজে কোনো বৈঠকে বা আলোচনা মজলিসে নিজের বড়াই করার মাধ্যমে স্বীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি, মান-মর্যাদা ও সুখ্যাতি প্রতিষ্ঠার অপপ্রয়াস চালানো হয়। শীর্ষ স্থানীয় হওয়ার বা সভাপতিত্বের আসন পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ

করা হয়। কেউ তার কোনো কথার প্রতিবাদ করলে তোসামোদ করা হয়। সে নিজে কাউকে উপদেশ দিলে মনে আঘাত দিয়ে কথা বলে, আর অন্য কেউ তাকে উপদেশ দিলে ঘৃণা করে, মেজাজ খারাপ করে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে ব্যক্তি বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না।

যে কোনো ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ-র কোনো মাখলুকের তুলনায় উত্তম মনে করবে, সে-ই দাম্ভিক।

মনে রাখবেন, প্রকৃত নেক ব্যক্তি সে-ই যে আল্লাহ-র কাছে প্রিয়। আর আল্লাহ-র কাছে প্রিয় হওয়ার বিষয়টি একমাত্র মৃত্যুর সময়ের অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। আর মৃত্যুর সময় কার কী অবস্থা হবে নিশ্চিত করে আল্লাহ তা জানা ছাড়া কেউ বলতে পারে না। শেষ পরিণতির ব্যাপারে চিন্তা যেন আপনাকে বদমায়েশি করা থেকে ফিরিয়ে রাখে। আপনি বর্তমানে সত্যের উপর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত আছেন বলে ভবিষ্যতে যে আপনার কোনো পরিবর্তন হবে না, একথা ভাববেন না। কারণ, অন্তরের পরিচালক আল্লাহ। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে হেদায়াত করেন এবং তিনি যাকে ইচ্ছা ধ্বংস করেন।

ফেৎনা কোথায় উগরাব

রাসূলুল্লাহ (সা.) একবার ইরশাদ করেন, "আমার পরে মুসলমানদের মধ্যে এমন একদল লোক উৎপন্ন হবে, তারা নানারকম উপায়ে খাদ্য গ্রহণ করবে, নানা বিচিত্র কারুকার্যপূর্ণ বহু মূল্যবান পোশাক পরিধান করবে, মনোমোহিনী সুন্দরী কামিনী রাখবে, মূল্যবান অশ্ব বাড়ির সামনে রাখবে, অল্প খানায় তাদের ভোজন প্রবৃত্তি পরিতৃপ্ত হবে না, অনেক পেলেও তাদের আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হবে না, তাদের সমস্ত শক্তি কেবল দুনিয়া অর্জনেই ব্যয়িত হবে। দুনিয়াকেই তারা প্রভু বলে মনে করবে। যা কিছু করবে দুনিয়া হাসিলের জন্যই করবে। আমি মুহাম্মাদ তোমাদের প্রতি নির্দেশ দিচ্ছি তোমাদের সন্তানরা তাদেরকে যেন সালাম না করে, তারা অসুস্থ হলে যেন তাদের সেবা না করে। তাদের জানাযায় যেন না যায় তাদের মুরব্বীদের যেন সম্মান না করে। এই শ্রেণীর ধনী লোকেরা ইসলামকে ধ্বংস করবে। তোমাদের সন্তানগণ যদি তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এবং সহানুভূতি প্রদর্শন করে, তবে তারাও ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে তাদের সাহায্যকারী ও সহায়ক হিসেবে গণ্য হবে।

[কিমিআয়ে সাআদাত]

সাধারণত আম মুসলিমরা তাদের পীর-মাশায়েখ, উস্তাদ, মসজিদের ইমাম, মুরব্বী আলেমদের অনুসরণ করে থাকে। ফলে তার মুরব্বী যে নকশার টুপি পরিধান করে, সেও সে ধরণের টুপি পরিধান করে। তার মুরব্বী যে স্টাইলের পাঞ্জাবী পরিধান করে, সেও সে ধরণের পাঞ্জাবী পরিধান করে। তার মুরব্বীর রুচি-মেজাজ-প্রকৃতিকে সে অনুসরণ করার চেষ্টা

করে। তার মুরব্বীর মাঝে জালালিয়াত থাকলে তার মেজাজও জালালি তরবিয়তের হয়ে যায়। তার মুরব্বীর তরবিয়ত জামালী হলে তার তরবীয়তও জামালী হয়ে যায়। তার মুরব্বী যদি আয়েশী হয়, সেও এটাকে দ্বীন মনে করে আয়েশী হয় ও ভোগের যিন্দেগী গঠন করে। তার মুরব্বী যদি বাবুগিরি যিন্দেগী যাপন করে, সেও তা করতে শুরু করে। তার মুরব্বী যদি দুই তলা বিল্ডিং বানায়, সে হয়ত বানাবে চার তলা বিল্ডিং। দলীল কী!! দলীল হলো "আমার মুরব্বী।" আমার মুরব্বী যদি ভোগবিলাসী যিন্দেগী যাপন করেও আল্লাহ ওয়ালা(!) হতে পারেন, তাহলে আমি কেন এভাবে আল্লাহ ওয়ালা হতে পারব না? সাধারণ মানুষ আলেমদের অনুসরণ করে, তাদের দলীল মনে করে। এভাবে একটি জাতি গোমরাহ হয়ে যেতে পারে। তাই আলেমের গোমরাহী অনেক ভয়াবহ ও মারাত্মক। বর্তমান যামানায় মুসলিমরা সাহাবাদের যিন্দেগী ভুলে গিয়েছে কাদের দেখে? আলেমদের দেখে। সাধারণ মানুষ জেমানার আলেমদের দেখে দ্বীনের উপর চলার চেষ্টা করে। এভাবে সুন্নতী যিন্দেগীর আদর্শগুলো আস্তে আস্তে মুসলিম সমাজে অপরিচিত হয়ে গিয়েছে। এর দায়ভার কে বহন করবে? সাধারণ মানুষ নাকি আলেম সমাজ?

"উলামায়ে ছু" – দের সম্পর্কে কিছু বলা হলে কিছু বেওকুফ ভাবে,
এটি তো উলামায়ে ছু – দের সম্পর্কে বলা হয়েছে। কিন্তু,
এটা কেন চিন্তা করে না যে সে নিজে উলামায়ে ছু – দের
অন্তর্ভুক্ত হয়ে বসে আছে কিনা? যদি তার মানসিকতা ও জিন্দেগী
রাসূলুল্লাহ – র জিন্দেগী বা সাহাবাদের জিন্দেগীর সাথে না
মিলে, তবে তো সে নিজেই উলামায়ে ছু। কেবল মাইকে
জ্বালাময়ী বয়ান করতে পারা, চারপাশে বহু মুরিদান থাকা,
দু-চার কলম লিখতে পারার নামই উলামায়ে হক্ক হওয়া
নয়। হাদীসে বর্ণিত জামানা অবশ্যই বর্তমান জামানা, যে
জামানার আলেমদের সম্পর্কে কঠিন ধমকি এসেছে। এরা
আল্লাহ – র রাসূলের জিন্দেগীর সুন্নতগুলোকে মিটিয়ে দিয়েছে।
উলামায়ে কেরাম যখন নিজের এবং অন্যান্য মানুষের
জিন্দেগীর চেষ্টা মেহনত ছেড়ে মসজিদ – মাদরাসার বিল্ডিং –
এর সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজে মাথানিবেশ করবে, তখন তারা
ইসলামকে ধ্বংস করবে। মুসলিমদের আত্মিক শক্তিকে
ধ্বংস করে দিবে। দ্বীনের নামে সুন্নতের খেলাফ কার্যক্রমকে
মানুষের সামনে দ্বীন হিসেবে উপস্থাপন করবে অর্থাৎ নতুন
নতুন ফিতনার জন্ম দিবে। নিজেরাও ফিতনাতে জর্জরিত
থাকবে। এমন ঘটলে তারা আল্লাহ – র দৃষ্টিতে সৃষ্টির
সবচেয়ে নিকৃষ্ট বলে বিবেচিত হবে, যদিও সে নিজেকে
রাসূলুল্লাহ – র ওয়ারিশ দাবী করে। কেননা তারা আল্লাহ
তা'আলার সেই প্রিয় দ্বীনকে মানুষের মধ্যে অপরিচিত করে
দিয়েছে, যে দ্বীনকে প্রতিষ্ঠা করতে স্বয়ং আল্লাহ – র রাসূল (সা.)
কে রক্তাক্ত হতে হয়েছে, হাজার হাজার সাহাবী
শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

এখন যা কিছু দ্বীন ও গ্রহণযোগ্য মনে করা হচ্ছে, তা আসলে নবীওয়ালা বা সাহাবাওয়ালা দ্বীন নয়। আপনি বলতে পারেন, যেভাবে আমরা দুনিয়া ভোগ করছি, তার পাশাপাশি দ্বীনের খেদমত করলে কি দ্বীনদারী হবে না? বিশ-পঁচিশটা মিহি কাপড়ের জামা নিয়ে যদি মাদরাসার শিক্ষক হই তাহলে কি দ্বীনের খেদমত করছি না? মুহতামিম হয়ে তিন-চার তলা বিল্ডিং বানালে সমস্যা কোথায়? ঘরে থেকে মুরব্বীর হাতে বাইয়াত হয়ে নিজের ইসলাহ করলে কি দ্বীন পূর্ণ হলো না? ঘরে আসবাব পত্র থাকলে সমস্যা কি, আমি কি দাওয়াতের ময়দানে জীবনকে কুরবান করে দিয়েছি না? দিনে তিনবার খেয়ে শক্তি অর্জন করে যদি জিহাদ করি, তাতে সমস্যা কোথায়? আমরা তো কোনো সমস্যা দেখছি না!

সমস্যা তো অবশ্যই আছে। যদি সমস্যা না-ই থাকতো, তবে সাহাবায়ে কেরাম কি এমনি এমনি দুনিয়া বিমুখতার মশক করেছেন? এতো টাকা-পয়সা, অর্থ-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও কি তারা শখে গরীব মানুষের মত জিন্দেগী যাপন করেছেন?

حب الدنيا

হযরত সুলাইমান ইবনে আবদুল মালেক (রহ:) হযরত আবু হাযিম (রহ:) কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, বলুন তো দেখি ভাই, আমরা মৃত্যুকে কেন ভয় করি? উত্তরে তিনি বললেন, মৃত্যুকে ভয় কর তার কারণ হল তুমি দুনিয়াকে আবাদ আর আখিরাতকে বরবাদ করেছ। তাই আবাদী ত্যাগ করে বিরান ভূমিতে যেতে মন চায় না। একথা শুনে হযরত সুলাইমান বললেন, বাস্তবিক, আপনি ঠিকই বলেছেন।"

দুনিয়া প্রীতি উম্মতের যে ক্ষতি করেছে তা হলো মৃত্যুর প্রতি অনাস্থা এবং ভয়। যার ফল দাড়িয়েছে কিতাল পরিত্যাগ।

> যে আলোকজ্জ্বল, ঝলমলে ঘর আর আরাম-আয়েশের বিছানার টান ছিন্ন করতে পারে নি, সে কিভাবে জিহাদের ময়দানে গুহার আঁধারে পাথরের বিছানাকে পছন্দ করবে? সে কি পারিবে ময়দানে ঝাঁপ দিতে?

> যে ফিট-পরিচ্ছন্ন কাপড় পরিধান করে অভ্যস্ত, ইস্ত্রী ছাড়া কাপড় পরতে পারে না সে কি পারবে ছেঁড়া, অপরিষ্কার, ইস্ত্রীহীন, তালিযুক্ত কাপড় পরে জিহাদের ময়দানে দিনাতিপাত করতে?

> যে তিন-চার বেলা খেয়ে অভ্যস্ত তার পক্ষে কিভাবে জিহাদের ময়দানে না খেয়ে কষ্ট করা সম্ভব? যার নফস অধিক খেয়ে পুষ্ট, তার নফস কি এখনি মরতে চাবে? আবার যে অধিক খেয়ে কামরিপুকে ধার করেছে, যে ডানে-বামে-সামনে-পিছনে সর্বত্র শুধু কাম দেখে, কামচিন্তা ছাড়া যে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারে না, প্রতিদিন যার স্ত্রী সহবাস না করলে চলে না, এক স্ত্রীতে যে সন্তুষ্ট হতে পারে না, সে কিভাবে ময়দানে কাম ছাড়া বছরের পর বছর থাকবে?

> যে প্রতিদিন গোসল না করে থাকতে পারে না, সে কি পারবে জিহাদের ময়দানে চল্লিশ দিন গোসল না করে থাকতে?

> যে বাড়ি-গাড়ি আর ডিগ্রির ধান্দা করে, সে কী পারবে, তার ডিগ্রি আর পেশা ছেড়ে দিতে? জিহাদ তো অনেক পরের কথা।

> যার দীল থেকে দুনিয়া উঠে যায়নি, আখিরাতের জন্য যার দীল আগ্রহী হয়নি, সে কি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিবে? আর যে দুনিয়াকে সঙ্কীর্ণ করেনি, নফসকে কষ্টে ফেলে নি, যার দুনিয়ার জিন্দেগীর প্রতি এখনও বিতৃষ্ণা তৈরি হয়নি, সে কি এখনি মরতে চাইবে? যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নেয়নি, সে তো জিহাদের প্রাক্টিস করতে করতে মৃত্যুর ধ্বনি শুনবে, জিহাদ মানে তার কাছে মনে হবে আযরাঈলের থাবা। তাহলে সে জিহাদ থেকে কেন পলায়ন করবে না? মৃত্যুর ভয়ে তার অবস্থা কেন মূর্ছাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মত হবে না? সে তো তখন অন্য আমলের মাঝে জিহাদের সওয়াব তালাশ করবে। এটাই স্বাভাবিক।

তখন তার মনোভাব হবে, জিহাদ না করে, মৃত্যুর ঝুঁকি না নিয়ে যদি জিহাদের সওয়াব পাওয়া যায়, তাহলেই তো ভাল। তখন দেখা যাবে সে হয়তো জিহাদ ত্যাগ করে যে জায়গা মৃত্যুর ঝুঁকিমুক্ত, আমলে সালেহ-এর নাম দিয়ে সেই রাস্তায়ই বেশি দৌড়-ঝাঁপ করছে। তখন শয়তান ও তার নফস মৃত্যু থেকে বাঁচার জন্য তাকে নানা রকম বুঝ দিবে।

> ঘরে বসে নফসের রিয়াযত করলে ময়দানের চেয়ে বেশি সওয়াব (জিহাদে আকবর) হবে!

> গুনাহ থেকে বাঁচলেই এখন সবচেয়ে বড় হিজরত হবে!

> মাদরাসায় বসে জিহাদের তামান্না করলে জিহাদের সওয়াব মিলবে!

> ঘরে বসে কিতাবাদি লিখলেই এখন জিহাদের মর্তবা হাসিল হবে!

> দাওয়াতের রাস্তা মানেই আল্লাহ-র রাস্তা, মানে জিহাদ!

> গণতান্ত্রিক পন্থায় রাজনীতি করলে জিহাদের সমান সওয়াব পাওয়া যাবে!

> মিছিল-মিটিং করলে ময়দানে লড়াইয়ের সওয়াব মিলবে!

> পুলিশের দিকে ইট-পাটকেল ছুঁড়লে বোমা নিক্ষেপ করার সওয়াব হাসিল হবে!

> আমার পীর আমীরে মুজাহিদ। তার হাতে বাইয়াত মানেই জিহাদ। তাই আমিও মুজাহিদ!

আবার অনেক লোকেরাও আছে, যারা যদিও মুখে বলে তারা জিহাদ অস্বীকার করে না। কিন্তু এদের আচার-আচরণ, চাল-চলন, হাব-ভাব, কথা-বার্তা পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝা যায়, এদের ভিতরে কী লুকায়িত আছে।

আরেকদল তো মরণের ভয়ে আরো একধাপ এগিয়ে যাবে। বলবে,

> এখন ক্বিতাল ফরযে আইনে হয়নি!
> এখনো ক্বিতাল করার প্রেক্ষাপট তৈরি হয়নি।
> চারিদিকে তো কেবল শান্তি আর শান্তি!
> ক্বিতাল করবো কার বিরুদ্ধে?!
> ইমাম মাহদির আগমন? সে তো লক্ষ-কোটি বছর পরে হবে!
> এখন "মক্কী জিন্দেগী" চলছে!
> এখন দাওয়াতের সময়।
> ইমাম মাহদি আসলে "মাদানী জিন্দেগী" শুরু হবে। তখন ক্বিতাল করা শুরু হবে!

জিহাদ করতে গিয়ে যেন মরা না লাগে সেজন্য আরেকদল জিহাদ থেকে পালানোর জন্য বলবে,

> জিহাদের জন্য ইসলামী রাষ্ট্র শর্ত, আগে দাওয়াতের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করতে হবে, পরে খলীফা বললে জিহাদ করবো!
> বর্তমানে যেহেতু আমরা দুর্বল, আমাদের শক্তি নেই, নেতা নেই, রাষ্ট্র নেই তাই জিহাদ-ও নেই!

> যেহেতু সরকারের গোয়েন্দারা আমরা ঘরে বসে বা বাইরে

মাহফিলে যা বয়ান করি তা রেকর্ড করে ফেলে, তাই এখন জিহাদী মেহনত মানে আত্মঘাতী মেহনত!

> গণতন্ত্রই এখন প্রকৃত জিহাদ!

> এখন জিহাদ কাফেরের বিরুদ্ধে নয়। বরং নফস এবং শয়তানের বিরুদ্ধে!

> এখন ঈমানী মেহনত করতে হবে। আগে মেহনত করে ঈমান ও ইখলাস হাসিল করতে হবে। পরে ময়দানে যেতে হবে!

আরেকদল তো মৃত্যুর ভয়ে আরো বহুধাপ এগিয়ে কাপুরুষত্ব-র শেষ প্রান্তে পৌছবে। অন্ডকোষ কেটে ফেলে নিজেদেরকে খোজা বানাবে। জিহাদ যেন পৃথিবীতেই না থাকে সেজন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে বসে, সাত পেটে আহার করে ধান্দা ফতোয়াবাজী করছে। অর্থ ও ক্ষমতা, পদ ও পদবীর লোভে সস্তায় নিজেদের ঈমান বিক্রি করে দিবে, বাতিলের তাবেদারী করবে আর বলতে থাকবে,

> যারা জিহাদ করছে তারা শরীয়তসম্মত জিহাদ করছে না। (!)

> জিহাদ মানে জঙ্গীবাদ বা সন্ত্রাস। আর ইসলাম শান্তির ধর্ম। (!)

> ইসলামে যত যুদ্ধ হয়েছে তা ধর্মের কারণে ছিল না। (!)

> ইসলাম ধর্মনিরপেক্ষ। (!!!) তাই ইসলামে জঙ্গীবাদ নেই। (!)

> এরা যা করছে তা জিহাদ নয়। জিহাদ অন্য জিনিস। (!)

> এরাই ইসলামটাকে নষ্ট করলো। (!)

> এরা যুদ্ধবাজী না করলে বাতিল উম্মতের উপর আক্রমণ করতো না। তাই উম্মতের ধ্বংসের জন্য এই মুজাহিদরাই দায়ী। (!)

> আল্লাহ-র রাসূল (সা:) সাহাবাদের সাথে নিয়ে বদর, উহুদ, খায়বার, হুনাইনে নিজেদের নফসের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন। (!)

> হাসিনা? সে তো আমিরুল মু'মিনীন (নাউযুবিল্লাহ)। (!)

সুতরাং কথা স্পষ্ট। দুনিয়ার মহব্বতের শেষ পরিণতি কাপুরুষতা। একে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আর, তাই উম্মত আজ কাপুরুষের জিন্দেগী যাপন করছে। জিহাদ ত্যাগ করেছে। আফসোস! দুনিয়া এই যামানার আলেমদেরকেও এমনভাবে গ্রাস করে ফেলেছে যে, তারা আজ একটি 'যরয়ে আইনে' হুকুমের বিরোধিতা করছে এবং তা অস্বীকার করছে। যেই সব আলেম উপরোক্ত এসব পঁচা ফতোয়া দিচ্ছে, এগুলো তাদের দীনের মধ্যে বিদ্যমান দুনিয়ার মহব্বত ও দুনিয়াতে বেঁচে থাকার স্পৃহাপ্রসূত উক্তি। এগুলো অক্ষম কাপুরুষোচিত উক্তি। মানসিক বার্ধক্য কিংবা বিকলাঙ্গতার পরিচায়ক। আসলে, এসব কুফরী কথা দ্বারা এই গোমরাহ আলেমগুলো বাতিল ও তাগুতকে সন্তুষ্ট করছে। আর যে বাতিল ও তাগুতকে খুশি করবে, সে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি অর্জন করবে। আর যে আল্লাহ তা'আলার অসন্তুষ্টি অর্জন করবে, সে আল্লাহ-র আযাব ও গযবের অপেক্ষা করুক। এগুলো কস্মিনকালেও নবীওয়ালা কিংবা সাহাবাওয়ালা ঈমান ও ইসলাম নয়। কাপুরুষকে আবার কে ভয় পায়? তাই সারা দুনিয়ার বাতিল শক্তি আজ মুসলিমদের উপর চড়াও হয়েছে। কুফফারদের দীল থেকে মুসলিমদের প্রভাব উঠে গেছে। আর উম্মাতের নসীব হয়েছে অপমান ও জিল্লতির যিন্দেগী।

যদি কোনো আলেমের মুখে এসব কথা শুনা যায়, তবে

→ সে "আল্লাহ-র রাসূলের ওয়ারিশ"-দের তালিকা থেকে ছিটকে পড়বে।
→ "নায়েবে নবী" হওয়ার সর্বশেষ যোগ্যতাটুকুও হারাবে।
→ বরং সে আল্লাহ, তাঁর রাসূল (সা.) এবং ইসলামের দুশমন।
→ এরাই উলামায়ে ছু। এরাই মন্দ আলেম।
→ বরং এরা আলেম নয়, জাহেল। আলেম নামের কলঙ্ক।
→ এদের দেখে উম্মত আজ উলামায়ে হক্বের উপর আস্থা হারাচ্ছে।
→ এরাই মূক, বধির, অন্ধ। ফলে এরা আর সঠিক পথে ফিরবে না।
→ এরাই মুনাফিক।
→ এরা দাজ্জালের চেয়ে বেশি ভয়ংকর।
→ এরাই নেক সুরতে, কুরআন হাদীসের দলীল দিয়ে, ভুল ব্যাখ্যা করে উম্মতকে গোমরাহ করছে।
→ এরাই ইসলামের ধ্বংসকারী।
→ এরাই আসমানের নিচে, জমিনের উপরে সবচেয়ে নিকৃষ্ট প্রজাতির প্রাণি।
→ এরাই পথভ্রষ্ট। এরাই কুলাঙ্গার।
→ এদের মস্তক পশু-পাখির বিষ্ঠা দ্বারা ভরে গেছে।
→ এরাই তো তারা, যারা আল্লাহ, ফেরেশতা ও সমস্ত মানুষের অভিশাপে অভিশপ্ত।

এদের সম্পর্কেই নবীজী (সা.) বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট, গোমরাহ আলেমদের সবচেয়ে বেশি ভয় করি।
[সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং-৪২৫২, তিরমিযী, হাদীস নং-২২২৯]

মাদরাসার সার্টিফিকেটধারীরা পথভ্রষ্ট

আমি দেখলাম, মাদরাসার সার্টিফিকেটধারীরা তাদের নিজেদেরকে বহুত বড় আলেম বলে মনে করে। গবেটের দল, আমার কথা খুব খেয়াল করে পড়। তোদের দুআ কেন কবুল হয় না? এখন একটা ট্রেন্ড হয়ে গেছে যে, গবেটের দল লম্বা লম্বা দুআ করে আমীন বলে। অথচ একটা দুআও যে কবুল হচ্ছে না সেই ব্যাপারে তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। কেন? কারণ কবুল করবানোর জন্য দুআ করা হয় না। দুআ করা হয় আমি যে বহু দুআ শিখেছি তা মানুষকে জানানোর জন্য। মাদরাসা থেকে যে ফারেগ হয়েছি বহু বছরে সেটা মানুষকে বুঝানো লাগবে না? মানুষ জানলে যে খাসীর রেজালা, মুরগীর রোস্ট, পোলাও-কোরমা, জর্দা-ফিরনি-পায়েস-সন্দেশ খাওয়ায়, সেগুলো কি আমার ডিগ্রি-সার্টিফিকেট সম্পর্কে না জানলে খাওয়াবে? যে সম্মান করে আর সম্মানী দেয়, সেগুলো কি আমার ডিগ্রি-সার্টিফিকেটের কথা না জানলে পাব? যদি না পাই, তাহলে এত বছর মাদরাসায় পড়ে কোন ছলাটা উল্টালাম? (বুঝছেন তো??) তোদের জীবনের সাথে না নবীর জীবনের কোনো মিল আছে না সাহাবীদের জীবনের। না ইবাদাতের ক্ষেত্রে মিল আছে, না ঘর-বাড়ির আসবাবপত্রের সাথে মিল আছে, না লেবাসের ক্ষেত্রে মিল আছে, না খানাপিনার ক্ষেত্রে মিল আছে, না নিয়তের ক্ষেত্রে মিল আছে। নবীজী (সো:) এরশাদ করেন, আমার পর তোমরা আবু বকর ও উমরের অনুসরণ করো।

হযরত আবু বকর (রা:) ইসলামপূর্ব যুগে মালদার ছিলেন।
ইসলামে তিনি যত পুরাতন হয়েছেন, তত দুনিয়াকে বিসর্জন
করেছেন, নিঃস্ব হয়েছেন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক তত
মজবুত হয়েছে। আর মাদরাসার সার্টিফিকেটধারী গোমরাহর
দল শুরুতে সাধারণ মানুষ থাকে। যত বেশি সার্টিফিকেট
হাসিল হতে থাকে তত টাকার সাথে সম্পর্ক বাড়তে থাকে।
আগে টিনের ঘরে থাকলে পরে আলিসান অ্যাপার্টমেন্ট
হাউসে থাকে। আগে দুই-চারটা জামায় চলতো। এখন
লাগে চল্লিশ-পঞ্চাশটা। আগে দুই বেলা খাবার পেত।
এখন খায় পাঁচ থেকে সাত বার। আগে ফ্লোরিং করে
থাকত। এখন থাকে বিছানায়। আগে সাইকেলে চড়ত। এখন
চড়ে হেলিকপ্টারে। আগে আম মানুষের সাথে মিশত।
এখন নারী প্রধানমন্ত্রীর সাথে মুসাফাহা করে (হা! হা!)।
আগে এমনভাবে থাকত যে কেউ চিনত না। এখন অর্থ, পদ
ও ক্ষমতার লোভে নিজেকে প্রকাশ করে। মঞ্চে গরম-গরম
ওয়াজ করে। তা-ও লক্ষাধিক টাকার কন্ট্রাক্টে সাইন করার
পরে। আর ওয়াজের বিষয়বস্তুগুলো কী কী? আমি
পার্লামেন্টের মৌলভি; গণতান্ত্রিক দেশের আলো-বাতাস
ভোগ করে বলো গণতন্ত্র মানো না, তাই না? আমার মুখ
দিয়া যেইটা বাইর হয় হেইটাই মার্কেট পায়। ইয়া আল্লাহ!

এমন দিনও দেখা লাগল !!

আমার নিজের অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। আমি মসজিদে মাগরিবের নামাজ পড়তে গিয়ে অজুখানায় প্রবেশ করি। এখন ২০২২ এর রমজান চলছে। সেখানে দেখি কয়েকটা বিশাল ডেকচি রাখা। ভিতরে একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন কত রকম খাবারের উচ্ছিষ্ট অংশ ছিল !! আমি আরেকদিন দেখি সেদিনও প্রায় একই অবস্থা। ইফতারির নামে মহাভোজের সমাপ্তিতে এত সময় লাগে যে মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে এসে মজুদ অথচ ইমাম খানায় লিপ্ত। জামাআত শুরু হচ্ছে না। চিন্তা করুন !! মানুষ নিজের বাসা থেকে এসে মসজিদে পৌঁছে গেছে অথচ ইমাম হযরত মসজিদে থেকেও এখনও জায়গামত পৌঁছাতে পারেননি !! একবার এমনও হয়েছে যে, ইক্বামাত দেয়া যার দায়িত্ব, তিনি পেটপূজায় লিপ্ত থাকায় একজন মুসল্লির ইক্বামাতে একজন ইমামি নামাজ শুরু করেন, যিনি কোনো মতে সেদিন পৌঁছাতে পেরেছেন। দিকে-দিকে মানুষ না খেয়ে মরে যাচ্ছে, মরে গেছে। সামনেও দুর্ভিক্ষ আসতে চলেছে। আর এরা সাত পেটে সাতশ পদের আইটেম দিয়ে মহাভোজে লিপ্ত। আমার ধারণা, আল্লাহ তা'আলা রমজান মাস দেয়াতেই এরা শুধু হালকা একটা ধারণা পেয়েছে ক্ষুধা কি জিনিস। নইলে এরা হয়তো জানতোই না সেটা কি। অথচ নবীজী (সা:) বলেন, পারস্পর ভালবাসা, রহমত ও সাহায্যের ক্ষেত্রে মুমিনদের অবস্থা একটি দেহের মত। তার কোনো অঙ্গ অসুস্থ হলে গোটা দেহ বিনিদ্রা ও জ্বরাক্রান্ত হয়ে পড়ে।

আশ্চর্যের বিষয়, দুনিয়ার কোথাও একটা কাফেরের উপর আঘাত আসলে যারা দুনিয়ার কুফফার গোষ্ঠীর মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে যায়। কুফরের বাঁধন তাদেরকে এক ডোরে বেঁধে ফেলেছে। কিন্তু, আমি কেমন মুমিন? ভাই-বোন আমার অনাহারে ধুঁকে-ধুঁকে মরেছে-মরছে। অথচ আমি রমজান মাসের বাধ্যতামূলক সময় ব্যতীত বাকী জীবনে ক্ষুধার কষ্ট ক্ষনিকের জন্যও টের পাই না। কেউ এতটা কুলাঙ্গার হলে তাকে ইসলামের কোন খেদমতে পাওয়া যাবে? কোন ভাইয়ের বিপদে পাওয়া যাবে? একবার আমি একটি মসজিদে মাগরিবের ওয়াক্তে ছিলাম। একজন মুসল্লি দেখলাম এসে দাড়ালেন। মাগরিবের আযান দিয়ে দেয়ার হালত। আর মাগরিবের আযান দেয়ার পর জামাআত যে কত দ্রুত শুরু হয় তা তো জানেনই। এমতাবস্থায় দেখলাম তিনি নামাজ শুরু করে দিলেন। ব্যাপারটা আমার সাথে অন্যান্যরাও দেখল। মসজিদে নামাজ পড়ায় এমন দু'টো ইমাম বসে ছিল পাশাপাশি। দেখলাম একটা এই দৃশ্য দেখে অন্যটার মনোযোগ এদিকে ফিরালো। সে বেশ হাসছিল। অথচ এটা কি সেই ব্যক্তির ঈমানেরই বহিঃপ্রকাশ ছিল না। এত মানুষ উপস্থিত থাকার পরও তিনি লোকলজ্জার পরোয়া করেননি। এটা কি হাসির বিষয় নাকি শিক্ষা নেয়ার বস্তু ছিল? হায় আল্লাহ!

কতা কি কিলিয়ার ??

আমি জীবনে অনেককিছুই দেখেছি যা চোখ থাকিতেও অন্ধ
ব্যক্তিরা দেখেনি। আমি ছোটবেলা থেকেই এমনসব বিষয়
দেখে আসছি যেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা আমার কাছে অন্যান্যদের
প্রদত্ত ব্যাখ্যার থেকে আলাদা মনে হত। আমার প্রায় বিষয়েই
প্রশ্ন জাগত। দেখতাম আমার ম্যানটালিটি খুবই
ডিফরেন্ট ক্যাটাগরির। সবাইকে একরকম আর নিজেকে
অন্যরকম দেখে আমি ভাবতাম, সবার তো আর ভুল হতে
পারে না। আমি এত ছোট হয়েও বুঝে ফেলি আর আমার
থেকে বড় বড়রা কেউ বুঝে না এটা তো হয় না। তাহলে,
নিশ্চয়ই আমারই ভুল হচ্ছে। কিন্তু, আজ আমি নিশ্চিত
যে সবগুলো গোমরাহ হয়ে গেছে। আর আমি সত্যকে
সত্যরূপেই দেখে আসছিলাম। যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে কোনো
কথা বলত না তারা যে না বুঝে এমন করত তা নয়। বরং,
এরা দুনিয়ার ভালবাসায় অন্ধ হয়ে বিক্রিত এবং বিকৃত হয়ে
গিয়েছিল। ছোটবেলায় দেখেছি এবং শুনেছি। আর, আজ
বুঝতে পারছি তখন কী দেখেছি, কী শুনেছি। আজ আমি
যা লিখার নিয়ত করে কলম হাতে নিয়েছি তা কখনই
মানুষদের প্রচলিত ধ্যান-ধারণার অনুগামী হবে না। বরং,
আমার পক্ষাবলম্বীর চেয়ে বিরুদ্ধাচারীর সংখ্যাই নিঃসন্দেহে
বেশি হবে। আর যদি বুঝতাম মানুষ আল্লাহর জন্য আমার
বিরোধিতা করছে। কিন্তু, মানুষ এজন্যই বিরোধিতা করে
আসছে যে আমি তাদের স্বার্থে আঘাত দিয়ে লেখালেখি করছি।

আর, যেহেতু এই বিরোধিতা আল্লাহর জন্য নয় বরং স্বার্থের জন্য। সেহেতু আমার কিছুই যায় আসে না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আল্লাহ প্রদত্ত হিদায়াতের উপর আছি, ততক্ষণ বাতিলের গোমরাহিকে আমি তেমন পাত্তা দিই না।

আমি দেখে আসছিলাম, মাদরাসার ছাত্রদের চেহারাগুলো অত্যন্ত কদর্য, অত্যন্ত কালো। চেহারা তো নিগ্রোদেরও কালো কিন্তু, নিগ্রোদের মত কালো আর কদর্য কালো এক নয়। আপনিও একটু দেখবেন, মসজিদের মুয়াজ্জিন, খাদেম এমনকি ইমাম সাহেবের চেহারাও কেমন জানি জঘন্য কালো ময়লা মাখা। চোখগুলো যেনো সাপের চোখ। অথচ, মসজিদ আল্লাহর ঘর। মসজিদের খেদমতের কাজে কেউ জড়িত থাকলে তো তার চেহারা নূরানী হওয়ার কথা। যদি বলেন, চেহারা নূরানী না নূর বিহীন তা দিয়ে আপনি কি করবেন? তাহলে আমি বলছি, আমার কাছে চেহারার গুরুত্ব খুব বেশি। আমি কিছু টের পাই চেহারার দিকে তাকিয়ে। মানুষের গুনাহের প্রভাব যে তার চেহারায় ফুটে উঠে তা কি আপনারা জানেন? নামাজ ত্যাগের একটা শাস্তির কথা এভাবে বলা হয়েছে যে, তার চেহারা থেকে নেককারদের নূর উঠিয়ে নেয়া হয়। আপনারা জানেন?

শরীরে একটা ভাব আইছে না ??

عن عبد الله بن عمر - أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب . [বুখারী, হাদীস নং: ৩০৮৯]।

অনুবাদ : আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সা· কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন।

কেন এই হাদীস বললাম সেটা পরে বিস্তারিত লিখব ইনশাআল্লাহ। আপনি কি জানেন কুকুর এবং উলামা শব্দগুলোর আবযাদ মান সমান?

الكلب >> 83 >> 11

العلماء >> 173 >> 11

ولو شئنا لرفعنه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هوىه ج فمثله كمثل الكلب ج [৭:১৭৬]

আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে তাকে সেই আয়াতসমূহের কল্যাণে উচ্চ মর্যাদাশীল করে দিতাম; কিন্তু সে তো দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগল। সুতরাং, তার অবস্থা কুকুরের মত।

আচ্ছা, বেশ্যা কাকে বলে?

এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে দেখলাম লিখা আছে, যে স্ত্রী-লোক যৌন সহবাসের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে।

কিন্তু, আমি পাঠকদের জন্য কিছুটা বিস্তারিত লিখতে চাই। যা সম্পূর্ণই আমার মত।

যে ব্যক্তি কোনো মাখলুকের কাছে তার শরীরকে বিক্রি করে, সে-ই হলো বেশ্যা। শরীর বিক্রি করার মানে যে শরীরের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি করতে হবে তা না। শুধু নিজের সেক্সুয়াল অর্গান কিছুক্ষণের জন্য বিক্রি করাতেই একটা মেয়েকে বেশ্যা বলে ফেলা হয়। অর্থাৎ, শরীরের এক বা একাধিক অংশকে বিক্রি করনেওয়ালাই বেশ্যা। কিন্তু, বেশ্যা যে শুধু নারীই হবে তা কে বলল। মার্কেটে নারীর যৌনাঙ্গের দাম আছে যেজন্য? কিন্তু তা তো কেবল পুরুষ ক্লায়েন্টদের জন্য। সকল মানুষের জন্য তো একই অবস্থা নয়। আর পুরুষের জীবনে কি শুধু নারীর যৌনাঙ্গই দরকার? আর কিছু লাগে না? আর যৌনতার প্রয়োজন কি পুরুষ জন্মের পর পরই অনুভব করা শুরু করে?

দেয়? নাকি একমাত্র বালেগা পুরুষই যে প্রয়োজন অনুভব করে? তাহলে দেখা যাচ্ছে বেশ্যা যদি শরীর বিক্রি করা কোনো মানুষকে বলা হয়, তবে যে শুধু নারীই হবে এমন নয়। একথা কেন বললাম? আচ্ছা, মার্কেটে কি মানবদেহের আর কোনো কিছুর ডিমান্ড নেই? মার্কেটে কি মানুষের কন্ঠের কোনো ডিমান্ড নেই? এত গান যে দুনিয়াতে বাজে তা কি মানুষ গায় না কি হায়ওয়ানে? যদি মানুষ গায় তাহলে কি শুধু পুরুষ গায় নাকি নারী নাকি উভয়েই? বেশ্যা নারীর কাস্টমার বেশি নাকি গায়ক-গায়িকা নর-নারীদের? একেকটা মিউজিক কনসার্টে কত মানুষ জেনে বুঝে যায় তা কি আপনারা জানেন? মানুষের মাঝে যৌনকর্মের প্রতি যতটা বিরূপ ধারণা, গান-বাজনার প্রতিও কি একই পরিমাণ বিরূপ ধারণা রয়েছে? তাহলে ফিতনা হিসেবে কোনটা বড়? আবার, প্রশ্ন উঠতে পারে আমরা যে দোকানে চাকরি করি, তাতেও তো টাকার বিনিময়ে নিজেদের মেধা, সময় এবং আমানতদারিতাকে বিক্রি করি। তাহলে কি আমরা বেশ্যা? এই পর্যন্ত এসে বেশ্যা শব্দের সংজ্ঞা পূর্ণতা পায়।
তাহলে বেশ্যা হলো এমন মানুষ যে আল্লাহ প্রদত্ত শরীয়তের হুকুম অমান্য করে নিজের শরীরকে হারাম কাজে মাখলুকের কাছে বিক্রি করে দেয়, চাই সে পুরুষ হোক অথবা নারী। আখিরুজ্জামানে এমন কিছু পুরুষকে আবির্ভূত হতে দেখলাম, যারা লক্ষ-লক্ষ টাকার বিনিময়ে কন্ঠ ব্যবহার করে ওয়াজের মাহফিলে।

Minx বা ছিনাল মানে কি?

ছিনালী বলতে বুঝায় ভ্রষ্টা নারীর চাতুরী হাবভাব, মিথ্যা প্রণয়। মান-অভিমানের ভান। অর্থাৎ, ছিনাল মানে হলো ভ্রষ্টা নারী, কুলটা।

আপনারা কি জানেন, ছিনাল, বেশ্যা এবং উলামা সবগুলো শব্দের আবযাদ মান সমান?

عاهرة >> 281 >> 11

فتاة وقحة >> 605 >> 11

العلماء >> 173 >> 11

হযরত উমার রাঃ বলেন, হে ইলম ও কুরআন ওয়ালারা! তোমরা ইলম ও কুরআন শিখিয়ে টাকা গ্রহণ করো না। তাহলে তোমাদের পূর্বে যিনাকারীরা জান্নাতে চলে যাবে। [হায়াতুস সাহাবা, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা: ৩৩৩]

কেন আজ এসব লিখছি? জানতে সামনে অগ্রসর হোন। বিস্তারিত আসছে ইনশাআল্লাহ।

মডারেট নায়েবে রাসূলদের খানাপিনা অধ্যায়

আজকে সকালে রিয়াদের বাসায় যাব কুরআন শিক্ষা দিতে। কত নাস্তা পাওয়া যায় সেখানে গেলে!! আর উম্মে রিয়াদের রান্না কত মজা!! পেট ভরে খাব। দুপুরে জুম্মা পড়িয়ে যাব আসগর সাহেবের বাড়িতে। সেখানে দাওয়াত আছে। ডিম ভুনা, খাসি ভুনা, ফালুদা, চমচম না জানি কত কিছু এবার খানার আইটেমে থাকে!! হে আল্লাহ, মেহেরবানি করে উত্তরোত্তর খানার আইটেমের ভ্যারাইটি, কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটি আরও উপরে তুলুন। আমিন। বিকালে মাদরাসাতে চা-বিস্কুট-চানাচুর হবে। বাদ মাগরিব জামাতে নুসরাতের নামে আরেক চোট দেয়া যাবে। রাতে ওয়াজ মাহফিল আছে!! সেখানে কী কী খাব ভাবতে গেলে মনে হয় স্ট্রোক করে ফেলব। কাজেই থাক। আর ভাবতেছি না। এবার অ্যাকশনে যাওয়া যাক।

উপরে বর্ণিত হালত-ই যে আজকের মডারেট র‍্যান্ড মৌলভিদের হালত সে ব্যাপারে চরম আহাম্মক ছাড়া আর কারো দ্বিমত নেই।

আগে আমি বুঝতাম না কেন এরা দুআতে শুধু আলেমদের কথা উল্লেখ করে। এখন বুঝি। আসলে সকল মানুষই ঘুরে-ফিরে স্বার্থপর। ঠিক যেভাবে পিতামাতারা শুধু বলেন পিতা-মাতার এই হক, এই মর্যাদা। উদ্দেশ্য হলো বেশি বেশি সম্মান ও খাতির লাভ।

ঠিক যেভাবে স্বামীরা বলেন, নবীজী আল্লাহ ছাড়া কাউকে সিজদা করতে বললে স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীকে সিজদা করতে বলতেন বলে হাদীস আছে। স্বামী যে স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট, সেই স্ত্রীর উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট। উদ্দেশ্য হলো হাজার-হাজার বার বিছানায় নেওয়া। ঠিক একইভাবে মাদরাসার কুলাঙ্গার সার্টিফিকেট ধারীরাও বলে, আলেমরা নবীদের ওয়ারিশ। উদ্দেশ্য হলো এই কথা বলে দ্বীনের প্রতি মহব্বত রাখনেওয়ালাদের আবেগকে নিজের পেটপূজা পূর্ণ করার কাজে লাগানো। হাদীসে আছে,

নবীজী (সা:) কোনো একদিন ফজরের নামাজ শেষে ঘরে এসে ব্রেকফাস্ট করেন। সকাল ৯.০০ টার দিকে বনু হাশিম থেকে কয়েকজন মানুষ এলে তাদের মেহমানদারির ব্যবস্থা করেন এবং নিজেও খানায় শরীক হন। তারপর দুপুরে লাঞ্চ করেন, বিকালে একটু ক্ষুধা অনুভূত হতেই কিছু চা-নাস্তা খেলেন এবং ইশার পরে ডিনার করে বিছানায় গেলেন।

হাদীসটি হযরত দাজ্জাল সূত্রে বর্নিত সরাসরি রুহ হুজুর ইবলিস লাআনাতুল্লাহি আলাইহি-র কওল। মাদরাসার প্রায় সকল কমবখতের দল এই হাদীসের উপর আমলকারি। হাদীসটি নেয়া হয়েছে "বিদআত জান্নাত লাভের রাস্তা" গ্রন্থ থেকে। পেয়েছেন তো?? পাননি??

আমি কি কাউকে গালি দিয়েছি ??

এবার সবকিছু স্পষ্ট করে লিখার সময় এসেছে। আপনাদের প্রত্যেককে বলতে চাই,

☐ এরাই কুকুর। নফসের খাহেশাতের নির্লজ্জ ইত্তেবা এসকল মাদরাসার সার্টিফিকেটধারীদের কুকুরের স্তরে নামিয়ে দিয়েছে। এদের কথা আল্লাহর থেকে নয়, আল্লাহর রাসূল থেকে নয়। কুকুরের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, কুকুর শায়তানের তরফ থেকে ইলহাম গ্রহণ করে। এরাও তাই। এরা আপনাদেরকে নেক সুরতে ধোঁকা দিচ্ছে।

☐ এরাই বেশ্যা। বরং, নফসানি খাহেশাতের নির্লজ্জ ইত্তেবা এদেরকে বেশ্যার চেয়েও অধম বানিয়ে দিয়েছে। এরা আল্লাহর দেয়া কণ্ঠকে আল্লাহর দ্বীন প্রচারের কাজে না লাগিয়ে আল্লাহর দ্বীনের বিনিময়ে দুনিয়া খরিদ করার কাজে লাগিয়েছে। দ্বীনি কথা সুর করে কেন বলা লাগে? আপনাদের মনে কি এই প্রশ্ন জাগে না? এটাই দ্বীন বিক্রি, এটাই দ্বীন বিক্রি, এটাই দ্বীন বিক্রি। সুর করে মাহফিলে ওয়াজ করার দ্বারা মানুষের মনকে ওয়াজের প্রতি আকৃষ্ট করার পরিবর্তে ওয়ায়েজের প্রতি আকৃষ্ট করা হয়। এরা হচ্ছে হাইয়েস্ট ক্লাস বেশ্যা। এরা সজ্ঞানে বেশ্যাবৃত্তির ফিল্ড হিসেবে বেছে নিয়েছে আল্লাহর দ্বীন প্রচারের মঞ্চমাকে। এভাবে কামাই করা অর্থ কিভাবে এরা ভোগ করে? কত নিকৃষ্ট এই কামাই !!

৭। এরাই ছিনাল। নফসের খাহেশাতের নির্লজ্জ ইত্তেবা এদেরকে ছিনাল বানিয়ে ছেড়েছে। ছিনাল মেয়েলোক যেমন জানে যে, তার কাছে এমন কিছু আছে যার প্রতি কিছু মানুষ দুর্বল। আর তার প্রতি দুর্বলদের কাছে এমনকিছু আছে, যার প্রতি সে নিজে দুর্বল। তাই, সে মিথ্যা প্রণয় - প্রেম - ইশক প্রদর্শন করে নিজের স্বার্থ উদ্ধার করে। ঠিক একইভাবে এরাও দেখেছে যে, আম মানুষ ধর্মের প্রতি দুর্বল। এই ধর্মের কথা যারা বলে, ধর্মীয় লেবাস যারা পরে তাদেরকে মানুষ মনে করে আল্লাহওয়ালা। আম মানুষ নিজেরা দ্বীনের কাজ তেমন করে না বা করতে পারে না। সেজন্য যারা এই দ্বীনের জন্য কাজ করে, তাদের খাতির - যত্ন, আদর - আপ্যায়ন করে এই আশায় যে হয়ত আল্লাহ তাঁর ওলীদের খেদমতের উসিলায় তাকে ক্ষমা করে দিবেন। আম মানুষের দেয়া তোহফা এবং ইকরামের প্রতি শয়তানের থেকেও এরা বেশি লোভী। মাদরাসায় ভর্তির প্রথম দিন থেকেই তারা চিন্তায় থাকে কখন সার্টিফিকেট হাসিল করব আর মানুষের আবেগ নিয়ে খেলে সম্মান ও প্রভাব - প্রতিপত্তি কামাব। সম্মানের লিপ্সায় দ্বীনকে বিক্রি করতেও এদের বাধে না। এরা যখন ওয়াজের মাহফিলে স্টেজ যেটে যেটে করে চেঁচে তখন অবুঝ ভাইয়েরা মনে করেন বুঝি খেলাফত কায়েম হয়ে যাচ্ছে। না রে ভাই। এরা স্রেফ আমাদের সাথে ছিনালী করছে।

ঢেলে দিবে ?? ঢেলে দিই ??

ওয়াহিন আসকান্ত মাদরাসার সার্টিফিকেটধারী এসকল কুকুর পারে শুধু দ্বীন নিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করতে আর সাধারণ মানুষের সাথে ছিনালী করতে। যদিও আসলে সে শুধু নিজের সাথেই ছিনালী করে, কিন্তু গন্ডমূর্খগুলো বুঝে না। আপনারা হয়তো নোটিস করেছেন, ওয়াজের মাহফিলে মিষ্টি খাওয়ার সুন্নাত, বকরি খাওয়ার সুন্নাত নিয়ে গলা, মাইক, সাউন্ডবক্স এবং শ্রোতাদের কান চিৎকার করে ফাটিয়ে ফেললেও দেশের শাসক জিন্দা ত্বাগুত হাসিনার বিদ্দাত নিয়ে একটা শব্দও এরা উচ্চারণ করে না। হাসিনার ইস্যুতে মুখে কুলুপ আঁটার ব্যাপারে সকল কন্ট্রাক্ট সই করা ওয়ায়েজিনদের মধ্যে এক নীরব ইজমা রয়েছে। এরপরও এদেশের ছাগলমার্কা নাগরিকরা এদের ভাওতামি বুঝতে পারে না। আপনারা কি বোঝেন না, 'আমানতু বিল্লাহি' পরিপূর্ণ হয়না 'ওয়া কাফারতু বিত ত্বাগুত' ছাড়া? আলো কি বুঝতে হলে অন্ধকারকে দরকার। হক্ক কি বুঝতে হলে বাতিলকে প্রয়োজন যাতে মানুষ কমপেয়ার করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কোন যোগ্যতায় লক্ষাধিক মানুষকে শাপলা চত্বরে সেদিন ডাকা হয়েছিল? শান্তিপূর্ণ মতাদর্শে ইসলামী-গণতান্ত্রিক ছাগলামি আন্দোলন করা কোন হাদিসে জায়েয ঘোষণা করা হয়েছে? এদের ঝুলিতে মাদরাসা থেকে বের হয়ে আসার সময় পাওয়া সস্তা সার্টিফিকেট ছাড়া আর কি এফিশিয়েন্ট কিছু আছে?

হিসাব বোঝো না ??

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

" اذا اقترب الزمان لم تكد تكذب

رؤيا المؤمن ، ورؤيا المؤمن جزء

من ستة وأربعين جزءا من

النبوة ۰ [সহীহ বুখারী (তাওহিদ)]

অনুবাদ : আবু হুরাইরাহ (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যখন কিয়ামাত নিকটবর্তী হবে, তখন মু'মিনের স্বপ্ন খুব কমই অবাস্তবায়িত থাকবে। আর মু'মিনের স্বপ্ন নবুওয়্যাতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর নবুওয়্যাতের কোনো কিছুই অসত্য হতে পারে না।

[হাদীস নং : ৭০১৭ / অধ্যায় : ৯১]

শারীয়ত ও তরীকতের স্তর পারি দিয়ে বান্দা যখন তার দীলকে গায়রুল্লাহ থেকে

পবিত্র করে সর্বদা দীলের জিকির জারি রাখে এবং নাওয়াফেলের বেশি বেশি এহতেমাম করতে থাকে, তখন আল্লাহ তা'আলা অদৃশ্য জগতের নানা দৃশ্য তার সামনে উন্মুক্ত করতে থাকেন। ইমাম গাযযালির মতে, "ফেরেশতা জাতির মূল পদার্থ এবং আম্বিয়া কেরামের আত্মাসমূহ সুন্দর আকৃতিতে মূর্তিমান হইয়া তাহার দৃষ্টি-পথে উপস্থিত হইতে আরম্ভ করে। এ সমস্ত দৃশ্য কখনো কখনো স্বপ্নেও দৃষ্টিগোচর হয়, আবার কোন সময় সচেতন অবস্থায় খোলা চোখেও দেখা যায়।" [কিমিয়ায়ে সাআদাত ; ৩য় খন্ড, পৃ: ৩৮]

এটা হাকীকতের স্তর। এই স্তরে বান্দা ঘন ঘন নেক স্বপ্ন দেখে থাকেন। আল্লাহর রাসূল (সা:), এমনকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দীদারও স্বপ্নে নসীব হয়ে থাকে। মাদরাসার সার্টিফিকেটধারী কুকুরের দল নিজেদেরকে যে নবীর ওয়ারিস দাবী করে, সারা জীবনে একবারও সেই নবীকে স্বপ্নে দেখে না। এমনকি ক্বিয়ামতের এই চরম নিকটবর্তী সময়েও না। অথচ, সার্টিফিকেট বিহীন মুজাহিদরা আল্লাহর রাস্তায় কিছুদিন জিহাদ করেই জান্নাতে নিজেদের স্থান পর্যন্ত স্বপ্নে দেখে ফেলেন। এ কেমন নবীর ওয়ারিস যার কাছে নবুওয়্যাতের ৪৬ ভাগের ০১ ভাগও আসে না? কাশফ নাই, কারামত নাই, ইলহাম নাই, সত্য স্বপ্ন নাই, তিনদিন পর পর খাওয়া নাই, আছে শুধু বেয়াদবি আর বিদআত। এরা হল মডারেট উলামা !!

হিদায়াতের বিনিময়ে গোমরাহি খরিদকারী উলামা-এ-জু

হাদীস

একদা প্রখ্যাত সাহাবী ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) মানুষের সামনে কুরআন পাঠে লিপ্ত এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। কুরআন পাঠ শেষে ব্যক্তিটি লোকদের কাছে কিছু মাল চাইলে তিনি - ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন - বলে উঠলেন। বলতে লাগলেন আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) - কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করল, এর বিনিময় সে যেন একমাত্র আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে। অচিরেই একদল লোক-এর আবির্ভাব হবে, যারা কুরআন পড়ে মানুষের কাছে বিনিময় আশা করবে।

[মুসনাদে আহমাদ ১৯৮৭৮]

জাবের বিন আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, অচিরেই একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা সুমধুর কন্ঠে কুরআন পড়ার চেষ্টা করবে। আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়াতেই তারা এর বিনিময় আশা করবে।

[আবু দাউদ ৮৩০]

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, তিন শ্রেণীর মানুষকে সর্বপ্রথম জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি - যে নিজে জ্ঞানার্জন করেছে, অন্যকেও তা শিক্ষা দিয়েছে ও কুরআন পড়েছে।

সে ব্যক্তি বলবে, আমি তোমার জন্য কুরআন পড়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছো। তোমাকে আলিম বলা হবে, ক্বারী বলা হবে, তাই তুমি এসব কাজ করেছ। তোমাকে দুনিয়ায় এসব বলাও হয়েছে। তারপর তার ব্যাপারে হুকুম দেয়া হবে এবং মুখের উপর উপুড় করে টেনে-হিঁচড়ে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (সংক্ষিপ্তভাবে মোটামুটি এরকম।)

[মিশকাতুল মাসাবীহ > ২০৫
সহীহ মুসলিম > ১৯০৫]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
من تعلم علما مما يبتغى به وجه
الله - عز وجل - لا يتعلمه إلا
ليصيب به عرضا من الدنيا، لم
يجد عرف الجنة يوم القيامة
يعني : ريحها

হাদীস

অনুবাদ : রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন কোনো জ্ঞান অর্জন করল, যার দ্বারা আল্লাহ আয্যা ওয়া জাল্লার সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা সে কেবল পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে অর্জন করল, কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না।

[আবু দাউদ > ৩৬৬৪
ইবনে মাজাহ > ২৫২
মুসনাদে আহমাদ > ৮২৫২]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء او يصرف به وجوه الناس إليه أدخل الله النار .

অনুবাদ : রাসূলুল্লাহ (সা:) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আলেমদের সাথে বিতর্কে জয়লাভের জন্য অথবা মূর্খদের সাথে বাক-বিতন্ডা করার জন্যে অথবা সাধারণ মানুষকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্যে ইলম অন্বেষণ করবে, আল্লাহ তা'আলা

তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

[মিশকাতুল মাসাবীহ : ১/৬৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ২২৫-২২৮ / ইমাম তিরমিযী, আস-সুনান : ৫/৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৮৫৪ / ইমাম ইবনে মাজাহ : ১/৭৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং : ২৫৩]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني لا أخاف على أمتي إلا الأئمة المضلين، فإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنهم الى يوم القيامة •

● অনুবাদ : রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি আমার উম্মাতের জন্য কোনো কিছুরই ভয় করি না, পথভ্রষ্ট ইমামদের ছাড়া। এভাবে যখন আমার উম্মাতের বিরুদ্ধে তলোয়ার উঠানো হবে, এটা তুলে নেয়া হবে না বিচার দিবস পর্যন্ত। [মুসনাদে আহমাদ : ১৬৪৭৩, ২১৩৮০]

এদেরকে পেটের সাইজ দেখে চিনে রাখুন

◎ আওযায়ী বলেন : খৃষ্টানদের গোরস্থান এই মর্মে আল্লাহর কাছে অভিযোগ করল যে, কাফের মৃতদের দুর্গন্ধে আমরা অতিষ্ঠ হচ্ছি। আল্লাহ তা'আলা বলে পাঠালেন : মন্দ আলেমদের পেটের দুর্গন্ধ তোমাদের মধ্যকার দুর্গন্ধের চেয়ে বেশী।

[ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন ›› প্রথম খন্ড ›› পৃষ্ঠা : ১৫০]

◎ কোন কোন আলেম নিজেদেরকে মুফতী হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং ভ্রান্ত ফতোয়া দেয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা পদ গ্রহণকারীদেরকে পছন্দ করেন না। এরূপ আলেম দোযখের চতুর্থ স্তরে থাকবে।

[ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন ›› প্রথম খন্ড ›› পৃষ্ঠা : ১৪৭]

◎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, শেষ জামানায় পথভ্রষ্ট আলেম বৃদ্ধি পাবে। তাদের ঘাড়ে হবে গোশতে আর পেট হবে উঁচু। আর তারাই দাজ্জাল।

[কিতাবুল ফিরদাউস : ৮:০৩]

◎ হাদীসে বলা হয়েছে, আল্লাহ পাক ভুঁড়িওয়ালা আলেমদেরকে পছন্দ করেন না। এক হাদীসে এসেছে, আল্লাহ তা'আলা নাদুস-নুদুস মুমিনদেরকে পছন্দ করেন না।

[ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন]

হিসাব এভাবে মিলাতে হয়

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন,

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

ফিতনা হত্যা অপেক্ষা জঘন্য

[سورة البقرة]

নবীজী (সা:), কুকুর মেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণকারীকে কুকুরের মত বলেছেন। হাদীস থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় শেষ জামানায় আলেমদের থেকে ফিতনা ছড়াবে এবং সেই ফিতনাতে তারা নিজেরাই পতিত হবে। সবকিছুর যোগফল দাঁড়ায় এই যে, বর্তমানে ফিতনার অবসান ঘটাতে হলে গোড়া কেটে ফেলতে হবে। অর্থাৎ, আলেম নামধারী জালেমদের জবাই করে ফেলতে হবে। এই কাজ সম্পাদনে কিছু সমস্যা আছে। বেশিরভাগ মুসলিম এসব মাদ্রাসার সার্টিফিকেটধারীদের ধর্মব্যবসা সম্পর্কে গাফেল। তাই, যদি এখন এদেরকে খুন করা হয় তাহলে, এসব মূর্খ মুসলিমরাই চিৎকার করে বলবে আলেমদের হত্যা করে ফেলছে জঙ্গীরা। তাই, এ কাজ করা যাবে না। একটা মজার ব্যাপার জানেন? দ্বীন ইসলামকে তো আল্লাহ জিন্দা করবেন।

সেক্ষেত্রে এসব মাদরাসার সার্টিফিকেটধারীরা নিঃসন্দেহে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং, এদেরকে উপড়ে ফেলা জরুরী। আল্লাহ সেটা কীভাবে করবেন? বর্তমানে আল্লাহ তা'আলা যে প্ল্যান করেছেন সেটা হলো, বাতিল দ্বারা বাতিল ধ্বংস। সুতরাং, এসমস্ত গোমরাহ বাতিল আলেম নামের জালিমদের আল্লাহ হিন্দুদের হাতে শেষ করতে যাচ্ছেন। ১১৬ জন ধর্মব্যবসায়ীদের তালিকা প্রকাশের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে ঘটনাটা সেদিকেই গড়াচ্ছে। তারা জিহাদের ডাক দেয় না। কারণ, জিহাদ হচ্ছে দ্বীন জিন্দা করার উপায়। জান এবং মালের কুরবানির দ্বারা। কিন্তু, তারা তো চায় আরও মাল লুটতে, জীবনকে আরো ভোগ করতে। তাই, মাল লুটের জন্য তারা ওয়াজ মাহফিলের ডাক দেয় কয়েকদিন পরপরই। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, পাপাচারী আলেম ও মূর্খ আবেদের কারণে আমার উম্মত বরবাদ হবে। সকল মন্দের মন্দ হচ্ছে মন্দ আলেম আর সকল ভালর ভাল হচ্ছে ভাল আলেম। এখন বুঝতে পারছেন কেন উলামা শব্দের সাথে কুকুর, বেশ্যা, ছিনাল এসবের আবযাদ মান মিলে?? যদি একজন ভাল আলেম হয় তাহলে সে নবীর ওয়ারিশ। আর মন্দ আলেম হলে কুকুর, বেশ্যা, ছিনাল। বর্তমানে বিদ্যমান মাদরাসার সার্টিফিকেটধারীরা নির্দ্বিধায় দ্বীনের বদলে দুনিয়া কামাই করায় নায়েবে রাসূল হওয়ার পরিবর্তে কুকুর, ছিনাল ও বেশ্যার স্তরে নেমে গেছে।

যখন এই আয়াত নাযিল হলো —

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام

আল্লাহ তা'আলা যাকে হেদায়াত করতে ইচ্ছা করেন, তার অন্তরকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। [৬ সূরা আনআম : ১২৫]

তখন সাহাবাগণ হুযুর (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। এই উন্মুক্ত করা কিরূপ? নবীজী (সা.) বললেন, এটি এক প্রকার নূর। যা অন্তরের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং তার প্রভাবে হৃদয় উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হয়ে পড়ে। সাহাবায়ে কেরাম আবারো জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ। এই নূর অন্তরে উৎপন্ন হওয়ার আলামত কি? উত্তরে রাসূলে কারীম (সা.) ইরশাদ করেন, এই ধোকার ঘর হতে মন উঠে যায়, সংসারের কোনো কিছুতেই মন আকৃষ্ট হয় না। চিরস্থায়ী আখিরাতের প্রতি মন ছুটে যায় এবং মৃত্যু আসার পূর্বে মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের জন্য সম্বল সংগ্রহে লিপ্ত ও ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

যে যে প্রকার মুসলিমই হই না কেন, যদি এই তিনটি আলামত আমাদের মাঝে না থাকে, তাহলে আমরা এখনো ইসলাম পাইনি।

একদিন হযরত হারেসা (রা.) নবীজী (সা.) -কে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যথার্থ মুমিন হতে পেরেছি। হুযুর (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, প্রমাণ কী? হযরত হারেসা (রা.) বললেন, আমার মন দুনিয়ার ধোকার জাল ছিন্ন করে এমনভাবে পলায়ন করেছে যে, আমার দৃষ্টিতে স্বর্ণ এবং পাথরের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় বস্তুই আমার কাছে সমান তুচ্ছ মনে হয়। বেহেশত এবং দোযখকে আমি যেন দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি। হুযুর (সা.) একথা শুনে বললেন, ঈমানের যে অবস্থা তোমার পাওয়ার দরকার ছিল, তা তুমি সঠিকভাবে পেয়েছ। এখন একে সযত্নে রক্ষা করো। অতঃপর তিনি বললেন,

عَبْدٌ نَوَّرَ اللّٰهُ قَلْبَهُ

এই ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার খাঁটি বান্দা। আল্লাহ তাআলা তার অন্তরকে আলোকিত ও উদ্ভাসিত করে দিয়েছেন।
[কিমিআয়ে সাআদাত, খন্ড-৪, পৃষ্ঠা-১৬৩]

লক্ষ্য রাখুন, কার ভিতরে ইসলাম ও ঈমানের নূর কতটুকু ঢুকেছে তা পরিমাপের উপায় হচ্ছে, তার মাঝে দুনিয়া ছাড়ার যোগ্যতা কতটুকু হাসিল হলো তা দেখা। আপনি যত বড় মাদরাসার শিক্ষক বা মুহতামিম হন না কেন, যত বড় বুযুর্গের মুরীদ হন না কেন, আপনি যত ঘন্টাই দাওয়াতের মেহনত করেন না কেন আর যত শক্তিশালী বীর মুজাহিদই হন না কেন, দুনিয়া ছাড়তে পারেননি তো ইসলাম আপনার মাঝে প্রবেশ করেনি। সুতরাং দুনিয়া ছাড়তে পারা প্রকৃত মুসলিম হওয়া না হওয়ার প্রশ্ন। সুতরাং বাহ্যিক লেবাস আর ভেজা দেখে কেউ যেন ধোকা না খায়।

যদি একজন সাহাবী জিহাদ করতে অক্ষম থাকা অবস্থায় তা ছেড়ে দিলে আলেম হতে না পারেন, বরং মুনাফিকের তালিকায় নাম চলে যায়। তাহলে বর্তমান যামানার আলেমরা জিহাদ না করে জিহাদের পক্ষে না থেকে, উল্টো পৃথিবীতে যেন জিহাদ না থাকে সেজন্যে জিহাদের বিরুদ্ধে ফতোয়াবাজি করে কিভাবে মুনাফিক হয় না? কিভাবে এরা আলেম হয়ে যায়?

ইমাম গাযযালী (রহঃ) তার "এহইয়াউ উলুমিদ্দীন" কিতাবে লেখেন, ফিকহ শব্দ বলে আল্লাহ-র রাসূল (সাঃ) সে জ্ঞান বুঝাননি, যা আপনারা ধারণা পোষণ করে থাকেন। প্রকৃত ফেকাহবিদ তিনিই যিনি আখিরাতকে দুনিয়া অপেক্ষা উত্তম বলে মানেন।

দুনিয়াদার জাহেলরা কিভাবে আল্লাহ-র খলীফাকে চিনবে বলুন? অথবা তারা এটাই বা বুঝবে কিভাবে যে তারা শেষ যামানাতে আছে? যে ব্যক্তি দীলের মাঝে দুনিয়ার মহব্বত লালন করে, যে ভবিষ্যতে সুখী হবে চিন্তা করে গাড়ি, বাড়ি, সুন্দরী নারীর আশা করে। বাড়ি, গাড়ি, সুন্দরী নারীর জন্য প্রয়োজন উত্তম সামাজিক অবস্থান। আর সামাজিক অবস্থান তৈরির জন্য লাগবে পদ-পদবী - দুনিয়াবী ডিগ্রি, অর্থ-সম্পদ। তখন এগুলোর লোভ তার দীলে ভর করবে। এগুলো হাসিলের জন্য তাকে চাকুরী করতে হবে, চাকুরীর জন্য দুনিয়াবী পড়াশুনা করতে হবে, দুনিয়াবী

পড়াশুনা করার জন্য তাকে স্কুল-কলেজ-ভার্সিটিতে পড়তে হবে, সেখানে পড়তে গেলে তাকে বেপর্দা, গান-বাজনা, নারীর মেলামেশায় পড়তে হবে। হয়ত সে প্রেম করবে বা অশ্লীল দৃশ্যসমূহ নিয়মিত দেখতে থাকবে। বেশি বেশি পড়াশুনার জন্য শরীর ঠিক রাখতে হবে চিন্তা করে তিন বেলা পেট ভরে খাবে, ফলে কামোত্তেজনায় ভুগবে। ফলে তেলের মধ্যে ঘি ঢালার ন্যায় অবস্থা তৈরি হবে। ফলে সে গুনাহে লিপ্ত হবে। এভাবে যিন্দেগীর একটা পর্যায়ে যখন সে এসে দাড়াবে তখনি সে দেখবে হয়তো তার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে বা হয়নি। যদি হয় তাহলে তার মনে পড়বে যে সে কি পরিমাণ মেহনত করেছে এই পর্যন্ত আসতে। এখনি যদি ফল ভোগ না করা যায় তাহলে এত কষ্টের কি লাভ? তাই সে মেহনতের ফল ভোগ করতে কি করা লাগে তা নিয়ে চিন্তা করবে। সে দেখবে দ্বীন তাকে কুরবানি করতে বলছে তার প্রিয় জিনিসকে। কিন্তু, এটা মানা তার জন্য এত সহজ নয়। ব্যাপারটা যদি এমন হত যে এসব কিছু সে রাতারাতি পেয়েছে তাহলে হয়তো অনুভূতি এত গাঢ় হতো না। কিন্তু তার বহু বছরের মেহনত জড়িত থাকায় ব্যাপারটা অন্য মাত্রায় গিয়ে পৌঁছেছে। এখনি সে এই দুনিয়া যা সে অর্জন করেছে তাকে মহব্বত করতে শুরু করেছে। আর দুনিয়া একটি ফিতনা। অর্থাৎ সে ফিতনাকে মহব্বত করতে শুরু করেছে। যে ব্যক্তি এই মহব্বতকে দ্বীনের জন্য ত্যাগ করতে পারে না সে আস্তে আস্তে দ্বীন থেকে দূরে সরে যেতে থাকে। তার কাছে তখন দ্বীনের যে অংশটা তার প্রিয় জিনিসের কুরবানি চায় সে অংশের প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়। ফলে সে শুধু দ্বীনের

নামাজ, রোজা, যিকির, তিলাওয়াত ও দু'আর সাথেই নিজের সম্পর্ক রাখে। বাকি দ্বীনকে সে দুনিয়ার জন্য ত্যাগ করে। যে তাকে সত্য বুঝাতে আসে তার সাথে সে শত্রুতামূলক আচরণ করে। ব্যাপার এমন না যে সে সত্যকে বুঝতে পারে না। বরং সে ফিতনাকে মহব্বত করে বিধায় ফিতনাকে ছাড়তে পারে না। ফলে তার মহব্বত তাকে অন্ধ, বধির, বোবা করে ছাড়ে। বহু টাকা খরচ করে বহু কাপড় বানিয়ে ফেললে সেগুলো কেউ না পরতে বললে ভাল লাগে না। মহল বানিয়ে ফেললে কেউ তাকে সেখানে না থাকতে বললে ভাল লাগে না। উত্তম খাওয়া-দাওয়া করে পেটের চাহিদা পূরণ করে কামাগ্নিকে জাগিয়ে তুলে নফসকে উত্তেজিত করে ফেললে কেউ ব্যভিচারের কাছে যেতে না বললে মানা খুব কষ্টকর হয়ে পড়ে। দেখুন, ইমাম মাহদিকে একজন কেন মানবে না একটু চিন্তা করুন। ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশ ঘটা মানে কি? ইমাম মাহদির আত্মপ্রকাশ ঘটা মানে এখন একের পর এক জিহাদ। কনস্ট্যান্টিনোপল বিজয়, আমাক্ব প্রান্তরে যুদ্ধ, মালহামাতুল কুবরা, গাযওয়াতুল হিন্দ, দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। যদি ইমাম মাহদিকে মেনে নিতে হয়, তাহলে তো এসব জিহাদেও যোগদান

করতে হবে। যে ব্যক্তি দুনিয়া ছাড়ার সংকল্প করেনি, যে ব্যক্তি ঈমানী মেহনত করেনি, যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নয়, যে ব্যক্তি মৃত্যুর কথা শুনলে ভয়ে মূর্ছা যায়, সে কি জিহাদ করতে পারবে? এমতাবস্থায় দুনিয়ার মহব্বত + মৃত্যুর ভয় বা "ওয়াহান" - এ মেন্তার ব্যক্তির নিজের দুর্বলতা গোপনের একটি পন্থা হলো ইমাম মাহদিকে অস্বীকার করা। এতে কাজের কারো কিছুই হয় না যদিও। শুধু নিজের ক্ষতি করা ছাড়া। যারা এখনই সকল জিহাদী তানজিমগুলোকে বাতিল ঘোষণা করে জিহাদ থেকে বিরত থাকছে, আল্লাহ-র আদেশ অমান্য করে ঘরে বসে ইমাম মাহদির আগমণের প্রতীক্ষা করছে, তারা ইমাম মাহদি আসলে তাঁকে চিনবে কিভাবে, মানবে কিভাবে? তারা হয়তো তিরমি খেয়ে বলবে ইমাম মাহদি কিভাবে আল কায়েদা - তালেবানের মত ভ্রান্ত(!) দলের আমীর হতে পারেন? বর্তমানে যেমন কাফের ও তাদের দোসর মুরতাদ সরকারেরা জিহাদে প্রতিবন্ধকতা তৈরী করেছে, শরিয়তের সমস্ত দলিল উপেক্ষা করে দরবারী আলেমরা জিহাদ বিরোধী ফতোয়া দিয়েছে, ইমাম মাহদির সময় পরিস্থিতি একেবারে ভিন্ন হবে এমন ভাবার কি কোনো কারণ আছে? তাছাড়া যারা ভাবছে, আল মাহদির আগমণ ঘটলেই তার মুহূর্তে দুনিয়ার সমস্ত ঝাই-ঝামেলা পেছনে ফেলে আল মাহদির সাহায্যার্থে ছুটে যাবে, এটা কি নিছক কল্পনা নয়? জিহাদ কোনো চাড্ডিখানি বিষয় নয়। জিহাদের জন্য মানসিক-শারীরিক-বস্তুগত সব ধরণের পূর্বপ্রস্তুতির প্রয়োজন রয়েছে। যারা জিহাদের আকাংক্ষা পোষণ করার দাবী করে কিন্তু এর জন্য কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করে না, কুরআনের সাক্ষ্য অনুযায়ী তারা মিথ্যাবাদী।

মালহামাতুল কুবরা

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً

যদি যুদ্ধে যাবার ইচ্ছাই তাদের থাকতো তবে এর জন্য কিছু না কিছু প্রস্তুতি অবশ্যই গ্রহণ করতো।

[সূরা তাওবাহ - ৪৬]

আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন,

قوله تعالى: {ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة} اي لو ارادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر. فتركهم الاستعداد دليل على ارادتهم التخلف. (تفسير القرطبي 8/156. دار عالم الكتب)

অর্থাৎ যদি তারা যুদ্ধ করতে চাইতো তাহলে সফরের প্রস্তুতি গ্রহণ করতো। সুতরাং তাদের প্রস্তুতি গ্রহণ না করা, যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার ইচ্ছা না থাকার দলিল।

ইমাম জাসসাস রহিমাহুল্লাহ বলেন,

قال الله تعالى: {ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة} فذمهم على ترك الاستعداد والتقدم قبل لقاء العدو.

(আহকামুল কুরআন: ৩/৮৭)

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যদি তারা যুদ্ধে বের হওয়ার ইচ্ছা করতো, তবে এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করত। যুদ্ধের সময় আসার পূর্বেই প্রস্তুতি গ্রহণ না করার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তিরস্কার করেছেন।

04-March,2020 Wednesday

মুশতাক মুহাম্মাদ

আরমান খান-ই

خليفة اللّٰه المهدي

মুশতাক মুহাম্মাদ আরমান খানই খলীফাতুল্লাহ আল মাহদি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, قرن (কুরণ)-র পরিমাণ হচ্ছে ৩৯ বা ৪০ বছর।
শেষ জামানায় বাইতুল্লাতে এক ব্যক্তি নিজেকে আল-মাহদি দাবী করবে যাকে হত্যা করা হবে। তার ৩৯ বা ৪০ বছর পর আরেক ব্যক্তি আল-মাহদি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবেন। তিনিই হবেন মুসলিম উম্মাহ-র প্রতিশ্রুত রাহবার আল্লাহর খলীফা প্রকৃত আল মাহদি। পৃথিবীর ইতিহাসে অনেক মানুষই নিজেকে আল মাহদি দাবী করেছে। কিন্তু বাইতুল্লাতে এ ধরণের ঘটনা মানবজাতির ইতিহাসে একবারই ঘটেছে। আর তা হলো ফেতনায়ে হারামের ঘটনা, যা সংঘটিত হয়েছিল পহেলা মুহাররাম ১৪০০ হিজরী (২০ নভেম্বর ১৯৭৯ ইসায়ী) তারিখে। যেদিন জুহাইমান আল উতাইবি নামে এক ব্যক্তি উম্মতের সামনে দাবী করে বসে যে, তারই ভগ্নিপতি মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল্লাহ আল কাহতানি ইমাম মাহদি। ঘটনাটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা হাদীসের ভাষ্যমতে, এমন ঘটনা বারবার ঘটবে না। দুইবার মাত্র ঘটবে। প্রথমবার ভুয়া মাহদির আত্মপ্রকাশ ঘটবে আর দ্বিতীয় বার প্রকৃত মাহদির আত্মপ্রকাশ ঘটবে। ১৪০০ হিজরীর (১৯৭৯ ইসায়ী সাল) ৪০ বছরের পরের সাল হলো ১৪৪১ হিজরী (২০২০ সাল) যার মধ্যে রমজান শুক্রবার। সুতরাং হাদীসের ভাষ্যমতে ১৪৪১ হিজরী (২০২০ সাল)-ই খলীফাতুল্লাহ আল মাহদির আত্মপ্রকাশের বছর। যেহেতু খলীফাতুল্লাহ আল মাহদি ৪০ বছর বয়সে আত্মপ্রকাশ করবেন। তাই, উনার জন্ম হয়েছে ১৪০১ হিজরী বা ১৯৮১ সালে। এরপরে আর কী বলার বাকী থাকে? এটা তো স্পষ্ট ব্যাপার যে, মুশতাক মুহাম্মাদ আরমান খান-ই ইমাম আল মাহদি।

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

" لَنْ يَعْجِزَ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ ".

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহ তা’আলা এ উম্মতকে অর্ধেক দিনের চাইতে কম সময়ের মধ্যে ধ্বংস করবেন না। সূনানে আবু দাউদ, হাদীস নং : ৪২৯৮

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنِّي لأَرْجُو أَنْ لاَ تُعْجِزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ " . قِيلَ لِسَعْدٍ وَكَمْ نِصْفُ يَوْمٍ قَالَ خَمْسُمِائَةِ سَنَةٍ .

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমি আশা করি, আমার উম্মত এত কষ্টকর হবে না যে, আল্লাহ্ তাদের অর্ধেক দিনের ও সুযোগ দেবেন না। তখন সাআদ (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়ঃ “ঐ দিনের অর্ধেক-এর অর্থ কি? তিনি বলেনঃ এর অর্থ পাঁচশত বছর। সূনানে আবু দাউদ, হাদিস নং : ৪২৯৯

হাফেয ইবনে হাজার আল আসকালানি (ইসলামের একজন বিখ্যাত আলেম যিনি ৮৫২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন) তার বুখারী শরীফের তাফসীর গ্রন্থ "ফাতহুল বারী"-র খন্ড-৪, অধ্যায় ৩৭ (হেজারা), পৃষ্ঠা ৪৪৮-৪৪৯-তে বলেন, ইহুদীদের সময়কাল মুসলমান ও খ্রিস্টানদের সময়কালের সমষ্টির সমান এবং এটা স্পষ্ট যে, শেষ নবী (সা.)-র আগমন পর্যন্ত ইহুদীদের সময়কাল দুই হাজার বছরের বেশী এবং তাদের পর খ্রিস্টানদের সময়কাল ছিল ৬০০ বছর। এই বর্ণনা দ্বারা এটিও সুস্পষ্ট যে, এই সভ্যাবিশ্বের বয়স খুব অল্পই বাকি রয়েছে।

হাদীস থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মুসলিম উম্মাহর হায়াতকাল একদিনের পর আরো অর্ধেক দিন পর্যন্ত বাড়ানো হয়। অর্থাৎ, উম্মতের সময়কাল হবে দেড় দিন। আল্লাহ তা'আলার কাছে একদিন এক হাজার বছরের সমান। [৩২ সূরা আসসাজদাহ : ০৫] সুতরাং, আল্লাহ তা'আলার কাছে দেড় দিন = ১.৫ X ১০০০ বছর = ১৫০০ বছর। এই ১৫০০ বছরের শুরুটা কখন হতে? এটা কি রাসূলুল্লাহ-র (সা.) জন্ম হতে (৫৭০ ঈসায়ী), নাকি নবুয়তপ্রাপ্তি (৪০ বছর বয়সে) হতে, নাকি হিজরত হতে, নাকি রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফাত হতে? এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ইসলামের শেষটা হচ্ছে কী দিয়ে? হ্যাঁ, নবুয়তের আদলে খিলাফত দিয়ে। মুসনাদে আহমাদের সেই বিখ্যাত ১৭,৬৮০ নং হাদীস থেকে বুঝা যায়, সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মৌলিকভাবে ইসলামের যাত্রা শুরু হয় নবুয়তী শাসনব্যবস্থা দিয়ে। আর এটি শুরু হয়

মদীনায় হিজরতের পর হতে। অর্থাৎ হিজরী প্রথম সাল থেকেই। সাহাবাগণ যখন নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র একটি ইসলামী ক্যালেন্ডার তৈরী করতে মনস্থ করলেন, তখন তারা এই হিজরতকেই সূচনা হিসেবে ধরেন। এ থেকেই বুঝা যায়, মূল ইসলামের যাত্রা শুরু হয় হিজরতের পর হতে। অর্থাৎ, প্রথম হিজরীই এই উম্মাহর হায়াতকালের প্রথম সাল। সুতরাং, ১৫০০ হিজরী-ই এই উম্মাহর আয়ুষ্কাল বা ইসলামের শেষ বছর। ইনশাআল্লাহ। যদি তাই হয়, তাহলে আল মাহদি আর কয় হাজার বছর পরে আসবেন? কিয়ামতের পরে নাকি একেবারে হাশরের ময়দানে ?????

বিভিন্ন হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী, আল মাহদি পৃথিবীতে ৫/৭/৮/৯ বৎসর খিলাফাহ পরিচালনা করবেন (তবে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হচ্ছে ৭ বছর) এবং হযরত ঈসা ইবনে মারইয়াম (আ.) ৪০ বৎসর খিলাফাহ পরিচালনা করবেন। এরপর আরো ৭ বছরের মত (কিছু কম বা বেশি) ইসলাম টিকে থাকবে। এরপর একটি বাতাস আসবে, যার মাধ্যমে পৃথিবীর সকল মুমিনের ইন্তেকাল হয়ে যাবে এবং পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে সৃষ্টির নিকৃষ্ট মানুষগুলো। যাদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে। অর্থাৎ, খলীফাতুল্লাহ আল মাহদির আত্মপ্রকাশের পর ইসলামের হায়াত অবশিষ্ট থাকবে ৯+৪০+৭ = ৫৬ বছর (কিছু কম বা বেশি)।

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন প্রতি শতাব্দীর শুরুতে আল্লাহ তা'আলা এমন কাউকে (মুজাদ্দিদ হিসেবে) পাঠাবেন যে ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত করবে।
[আবু দাউদ, হাদীস নং - ৪২৯১]

মুসলিম বিশ্বের সর্বশেষ খিলাফত ছিল তুরস্কের উসমানী খিলাফত যা ধ্বংস হয়েছিল ০৩ মার্চ, ১৯২৪ ঈসায়ী (২৬ রজব ১৩৪২ হিজরী) সালে। ২৬ রজব ১৪৪১ পূর্ণ হলো খিলাফত ধ্বংসের হিজরী ৯৯ বছর। ২৭ রজব ১৪৪১ হতে শুরু হয়েছে খিলাফত ধ্বংসের শততম হিজরী বৎসর। ১৪৪১ হিজরীর মধ্য রমজান শুক্রবার। ইনশাআল্লাহ ১৪৪১ হিজরীই সেই প্রতিশ্রুত সময়। খলীফাতুল্লাহ আল মাহদির খিলাফত কাল ৭ বছর ধরা হলে, তার আগমনের সাল আসে ১৪৪৬ হিজরী (২০২৫ সাল) বা তার পূর্বে।

ইমাম মাহদীর আগমনের লক্ষণ দুটি - (এক.) রমজান মাসের প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ এবং (দুই.) রমজান মাসের মাঝামাঝি সূর্যগ্রহণ। [ইবনে হাজার আল হাইথামী, আল কওল আল মুখতাছার ফী আলামাত আল মাহদী আল মুন্তাযার, পৃষ্ঠা - ৪৭]
..... রমজান মাসের মাঝামাঝি সূর্যগ্রহণ এবং মাসের শেষে চন্দ্রগ্রহণ .....
[আল মুত্তাকি আল হিন্দী, আল বুরহান ফী আলামাত আল মাহদী আখির আল যামান, পৃষ্ঠা - ৩৭]
ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে দুটি সূর্যগ্রহণ হবে।
[আশশারানি, মুখতাছার তাযকিরা আল কুরতুবি, পৃষ্ঠা - ৪৪০]

ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে রমজান মাসে দুইবার চন্দ্রগ্রহণ হবে। [আবু নুআইম : আল ফিতান, ইবনে হাজার আল হাইসামী, আল কুওল আল মুখতাজার ফী আলামাত আল মাহদী আল মুন্তাযার, পৃষ্ঠা - ৫৩, বারযানযি, আল ইশাআহ, পৃষ্ঠা - ২০]

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কিত উপরের বর্ণনাগুলোতে কিছুটা বৈপরীত্য মনে হলেও বাস্তবে যা ঘটেছে তা জানলে হয়ত অবাক হবেন। নিকট অতীতে এমন কোনো ঘটনা ঘটেছে কি? জি হ্যা, ১৯৮১ ও ১৯৮২ সালে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ উভয়টিই ঘটেছিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, চন্দ্রগ্রহণটি ছিল "পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ" যা হাদীসে বলা হয়েছে। এছাড়াও বিশ বছর পর বিস্ময়করভাবে একইরকম চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ঘটনা ঘটে ২০02 এবং ২০০৩ সালে !

প্রকৃত গ্রহণ		তারিখ
চন্দ্রগ্রহণ	—	হিজরী ১৪০১ (১৫ রমজান) / ১৭ জুলাই ১৯৮১
১৫ দিন পর সূর্যগ্রহণ	—	(২৯ রমজান) / ৩১ জুলাই
চন্দ্রগ্রহণ	—	১৪ (রমজান) / ০৬ জুলাই
১৫ দিন পর সূর্যগ্রহণ	—	২৮ (রমজান) / 20 জুলাই
২০ বছর পর চন্দ্রগ্রহণ	—	হিজরী ১৪২৩ (মধ্য রমজান) / ২০.১১.02
১৫ দিন পর সূর্যগ্রহণ	—	(শেষ রমজান) / 04.১২.02
চন্দ্রগ্রহণ	—	(মধ্য রমজান) / 0৯.১১.0৩
১৫ দিন পর সূর্যগ্রহণ	—	(শেষ রমজান) / ২৩.১১.0৩

আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, একই মাসে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ প্রাকৃতিকভাবে / বৈজ্ঞানিকভাবে কোন স্বাভাবিক নিয়ম নয়। এরকম দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। সুতরাং ইতিহাসের কোথাও এমন পাওয়া গেলে তা অবশ্যই আমাদের জন্য চিন্তার বিষয় !!!!!

ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে লেজ বিশিষ্ট তারকার (ধূমকেতু) আবির্ভাব ঘটবে। [মুহাম্মাদ ইবনে আবদ আল রাসূল বারযানজি, আল ইশাআহ লি আশরাত আল সাআহ, পৃষ্ঠা - ২০৩, ইবনে হাজার আল হাইসামী, আল কওল আল মুখতাসার ফী আলামাত আল মাহদী আল মুন্তাযার, পৃষ্ঠা - ৫৩]
চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের ঘটনা ঘটার পর লেজ বিশিষ্ট তারকা দেখা দিবে। [আল মুত্তাকি আল হিন্দী, আল বুরহান ফী আলামাত আল মাহদী আখির আল যামান, পৃষ্ঠা - ৩২]

১৯৮৬ সালে (১৪০৬ হিজরী) "হেলীর ধূমকেতু" পৃথিবীর নিকট দিয়ে গমন করে। এটি ছিল অতি উজ্জ্বল, ঝলমলে তারকার ন্যায়।

ইমাম মাহদীর আগমনের পূর্বে পূর্ব দিক হতে আলো বিচ্ছুরণকারী শিঙার মতো দেখতে দুই দাঁত / লেজবিশিষ্ট তারকার (ধূমকেতুর) আবির্ভাব হবে।
[ইমাম রব্বানি, মাকতুবাত, পত্র. ৩৮১, পৃষ্ঠা. ১১৮৪]
যেখানে অন্যান্যদের মহাজাগতিক বস্তুর গতি পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে ..... এই ধূমকেতুটির গতি পূর্ব দিক হতে পশ্চিম দিকে হবে।
[ইমাম রব্বানি, মাকতুবাত, পত্র - ৩৮১, পৃষ্ঠা - ১১৮৪]

উক্ত হাদীসটিতে যে ধূমকেতুর কথা বলা হয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথমবারের মত প্রকাশ ঘটেছে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ সালে। এর নাম "লুলিন ধূমকেতু" (Lulin Comet)। হাদীসের বর্ণনার সাথে ধূমকেতু লুলিনের যে মিল তা এক অত্যাশ্চর্যজনক ঘটনা এবং মুমিনদের জন্য এক শুভ সংবাদ যে, আল্লাহ-র খলীফা আল মাহদির জন্ম হয়ে গিয়েছে, ইনশাআল্লাহ।

২০১৮ সালে লাল চাঁদ দেখা গিয়েছে। লাল চাঁদ হলো হাদিসে বর্ণিত ইমাম মাহদি আসার সর্বশেষ তিনটি আলামতের একটি। বিজ্ঞানীরা মিথ্যা প্রচার করেছে যে, প্রতি ১৫০ বছরে একবার লাল চাঁদ দেখা যায়। যেহেতু আমাদের দ্বারা প্রমাণ করা সম্ভব নয় যে ১৫০ বছর আগে ১৮৬৮ সালে লাল চাঁদ উঠেনি। আসল কথা হল, লাল চাঁদ দুনিয়ার ইতিহাসে আর একবার উদিত হয়েছিল, যেদিন হযরত হুসাইন (রা.)-কে কারবালায় আরো ১৭ জন আহলে বাইত পুরুষের সাথে হত্যা করা হয়েছিল। আর দ্বিতীয়বার লাল চাঁদ উদিত হওয়ার কথা যখন ইমাম মাহদি আসার সময় একেবারে নিকটবর্তী। মুসলিমদের বেওকুফ পেয়ে ইহুদি-নাসারারা মিডিয়াতে যা ইচ্ছা প্রচার করে যাচ্ছে, আর আমরা তাই বিশ্বাস করে নিচ্ছি।

Lulin Comet

লুলিন ধূমকেতু

الدِّينُ النَّصِيحَة

এক কথায় আপনার করণীয় কী যদি জানতে চান তাহলে বলছি, আপনি আল্লাহ ব্যতীত যা কিছু আছে সবকিছু ছেড়ে দিন। অর্থাৎ গাইরুল্লাহকে ছাড়ুন। দুনিয়াবী আশা-আকাংখা সংক্ষিপ্ত করুন। সকল বিদআত পরিহার করুন। নফসের খাহেশ অনুযায়ী না চলে বরং নফসের খাহেশের বিরুদ্ধে চলুন। নিজের সকল চাওয়া যেন কেবল আল্লাহ-র নিকট হয়। আল্লাহ-ই যেন একমাত্র আপন হন। আল্লাহ-র সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পরোয়া ছাড়া আর সবকিছুর ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেপরোয়া হয়ে যান। যত বেশী পারেন তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করুন। নির্জনতা থেকে নিজের অংশ হাসিল করুন। মানুষের নিকট আল্লাহ-র দ্বীন পৌঁছানো ব্যতীত মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে যান। অধিক সময় চুপ থাকুন। ঘন ঘন তাওবা এবং ইস্তেগফার করুন। নিজের জীবনে গারীব(অপরিচিত) ইসলাম বাস্তবায়ন করুন। আর এজন্য চাই সহীহ ইলম, সহীহ বুঝ। সহীহ ইলমের নূর পেতে চাইলে এক বেলা আহার শুরু করুন, দুনিয়া ছাড়ুন। সাহাবাগণ কিতাব পড়ে আলেম হননি। তাহলে তারা একেকজন কিভাবে দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ আলেম হলেন? তারা আল্লাহ-র রাসূলের কথা শুনে শুনে, তার যিন্দেগী দেখে দেখে নিজের যিন্দেগী সেভাবে বানিয়ে, অনবরত ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করে করে, এরপর কুরআন তিলাওয়াত করে কুরআন উপলব্ধি করে করে ইলম হাসিল করেছিলেন। শাইখ মাহমুদ আল হিন্দী বলেন, "বর্তমান যামানায় সবচেয়ে বড় দাওয়াত,- উম্মতকে অপরিচিত ইসলামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া।" সে ব্যক্তি বেওকুফ ছাড়া আর কী, যার যিন্দেগী সমাজের আর দশজন দ্বীনদারের সাথে মিলে আর সে ইমাম মাহদির সাথী হবার আশা রাখে? মনে রাখবেন, যার মধ্যে আল্লাহর ভয় পয়দা হয়েছে, সে ইলম হাসিল করে নিয়েছে, যদিও সে কখনও মাদরাসায় পড়েনি।

আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, শীঘ্রই মানুষ তোমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য আহবান করতে থাকবে, যেভাবে মানুষ তাদের সাথে খাবার খাওয়ার জন্য একে-অন্যকে আহবান করে। জিজ্ঞাস করা হলো, তখন কি আমরা সংখ্যায় কম হবো? তিনি বললেন, না, বরং তোমরা সংখ্যায় হবে অগণিত। কিন্তু তোমরা সমুদ্রের ফেনার মতো হবে, যাকে সহজেই সামুদ্রিক স্রোত বয়ে নিয়ে যায় এবং আল্লাহ তোমাদের শত্রুর অন্তর থেকে তোমাদের ভয় দূর করে দিবেন এবং তোমাদের অন্তরে আল-ওয়াহন ঢুকিয়ে দিবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল (সা.), আল-ওয়াহন কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং ক্বিতালকে অপছন্দ করা। [মুসনাদে আহমাদ, খন্ড: ১৪, হাদিস নম্বর: ৮৭১৩, হাইসামী বলেছেন: হাদিসটির সনদ ভাল, শুআইব আল আরনাউতের মতে হাদিসটি হাসান লি গাইরিহি]

قال: حب الدنيا و كراهية الموت

সাওবান (রা.) হতে বর্ণিত হাদিসে এসেছে: দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।

হাদিস

عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم

[সুনানে আবু দাউদ, হাদিস: ৩৪৬২]

ইবনে উমর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূল (সা:) - কে বলতে শুনেছি যখন তোমরা ঈনা পদ্ধতিতে ব্যবসা করবে, গরুর লেজ আকড়ে ধরবে, কৃষিকাজেই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর লাঞ্ছনা ও অপমান চাপিয়ে দিবেন। তোমরা তোমাদের দ্বীনে ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি তোমাদেরকে এই অপমান থেকে মুক্তি দিবেন না।

قال الم اقل لك انك لن تستطيع معى صبرا

আমি কি বলিনি যে, আপনি আমার সাথে ধৈর্য ধরে থাকতে পারবেন না (৭৫)

قَالَ إِن سألتك عن شيءٍ بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا

এরপর যদি আমি আপনাকে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করি, তবে আপনি আমাকে সাথে রাখবেন না। আপনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগমুক্ত হয়ে গিয়েছেন। (৭৬)

قَالَ هذا فِرَاقُ بَيْنِى وَبَيْنِكَ سَانَبِّئُكَ بِتَاوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَّلَيْهِ صبرا

এখানেই আমার ও আপনার মাঝে সম্পর্কচ্ছেদ হলো। এখন যে বিষয়ে আপনি ধৈর্য ধরতে পারেননি, আমি তার তাৎপর্য বলে দিচ্ছি। (৭৮)

[سورة الكهف]

আপনি কি জানেন আগামী
০৮ই মে ২০২৪ থেকে শুরু
হতে পারে ভয়ংকর
গাজওয়াতুল হিন্দ ??
কীভাবে দিনক্ষণ নির্দিষ্ট করে
বলতে পারছি ভেবে অবাক
হচ্ছেন ?? জানতে চাইলে
পড়ুন,
"শাহ নিয়ামাতুল্লাহ
কাশ্মীরীর ক্বাসীদায় বর্ণিত
হাবিবুল্লাহ এবং সাহেবে
ক্বিরাণ-এর পরিচয় প্রকাশ।"

Go to -

https://archive.org/details/picsart-22-06-17-09-08-05-585
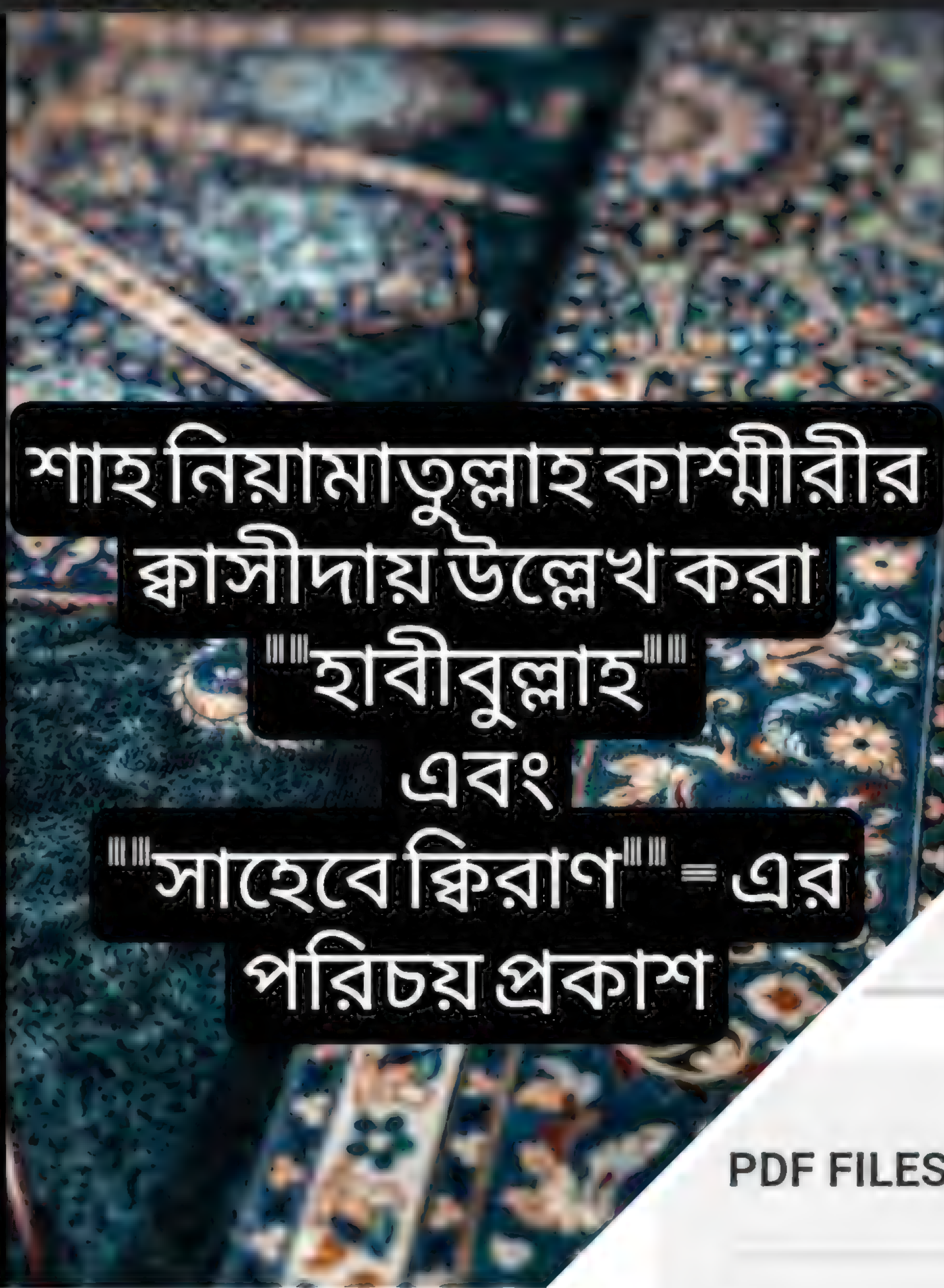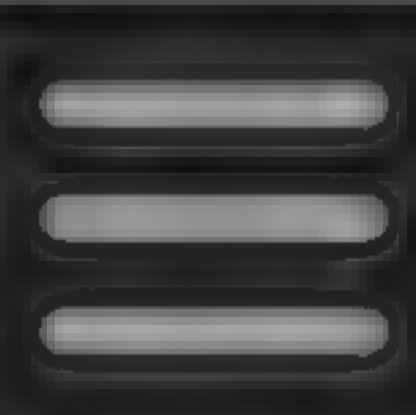
Archive.org
Channel Name :
Cypher5
Telegram ID :
https://t.me/Cyp
her55555

فطوبى للغرباء

মনে করুন, আপনি দুপুরের খানা খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছেন। আর, চিন্তা করছেন আল্লাহ রাসূলের এবং তাঁর সাহাবীদের যিন্দেগী কেমন ছিল। আহ! যদি তাদেরকে দেখতে পারতাম। সেই যামানায় যদি আমার জন্ম হতো। হঠাৎ দরজায় নক করার শব্দ হলো। আপনি দরজা খুলে একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন। এমন অদ্ভুত কাউকে আপনি আগে কখনো দেখেননি। আপনি দেখলেন, তিন-চার দিন না খাওয়া হাড্ডিসার প্রায়, জীর্ণ-শীর্ণ, চৌদ্দটি তালিযুক্ত জামা পরিহিত একজন মানুষ। আপনার কাছে মনে হচ্ছে, একটু ঝাপ্টা হাওয়া বইলেই লোকটি উড়ে যাবে। সম্ভবত আপনার এলাকার ফকীররাও এমন পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে না। তাদের পোশাকও মনে হয় আরো স্মার্ট। আপনি ভাবলেন, হয়তো লোকটি ভিক্ষা করতে এসেছে। আপনি পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে দিলেন। লোকটি আপনাকে বললেন, আমি ভিক্ষা নিতে আসিনি। আপনি বললেন, ও! আপনি বোধ হয় খানা চাইতে এসেছেন। আপনাকে খুব ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত দেখাচ্ছে। লোকটি আপনাকে বললেন, না, আমি খানা খেতেও আসিনি। তখন আপনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে আপনি কে, এখানে কী চান? লোকটি দ্ব্যর্থহীনভাবে বললেন, আমি মুসলিমদের মধ্যে একজন। আমি আপনাকে আল্লাহ-র রাসূলের রেখে যাওয়া গারীব (অপরিচিত) ইসলাম শিখাতে এসেছি। সাহাবাওয়ালা যিন্দেগী কাকে বলে তা দেখাতে এসেছি।

ইনশাআল্লাহ, খুব শীঘ্রই পৃথিবীতে এমন-ই কিছু অপরিচিত, জরাজীর্ণ, আনস্মার্ট মানুষের আত্মপ্রকাশ ঘটবে, যাদেরকে এ যামানার সাধারণ দ্বীনদাররাও চিনে না, বিশেষ দ্বীনদার

মহলের সাথেও যাদের যিন্দেগী মিলে না। অবাক বিস্ময়ে পৃথিবী এমন কিছু ব্যতিক্রমধর্মী মুসলিমদের দেখবে, যাদের মতো মানুষ পৃথিবী এর আগে সম্ভবত চৌদ্দশত বছর পূর্বে দেখেছিল। তারা আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই বুঝবে না। পৃথিবীর কোনো পরাশক্তির রক্তচক্ষু তাদেরকে ভীত করতে পারবে না। বিপরীতে তারাই পৃথিবীকে শোষবারের মত কাপিয়ে তুলবে। দুনিয়ার সকল ত্বাগুত ও বাতিলের মসনদকে তছনছ করে গুড়িয়ে দিবে। এক আল্লাহ-র আইন প্রতিষ্ঠা করবে। আপনিও সামিল হোন গুরাবাদের (অপরিচিতদের) কাফেলাতে।

ওহে মুসলিম যুবকেরা! তোমাদের রক্ত কেন এমন হিম শীতল হয়ে গেল? কেন তা অগ্নিস্ফুলিঙ্গে রূপান্তরিত হচ্ছে না? তোমাদের অন্তরে কেন প্রতিশোধের দাবানল তৈরী হচ্ছে না? তোমরা কি অপেক্ষা করছ, কাফির-মুশরিকরা তোমার চোখের সামনে তোমার মা, বোন, স্ত্রী আর কন্যাকে ধর্ষণ করবে, তোমার সন্তানকে কেটে টুকরা টুকরা করবে, তোমার পিতা আর ভাইকে আগুনে পুড়িয়ে মারবে, তারপর তুমি ময়দানে ঝাপ দিবে? এই মালউন শয়তানদের কি তুমি এমনি এমনি ছেড়ে দিবে? তোমাদের হৃদয়ে কেন অনুশোচনার ঝড় বইছে না? কাপুরুষের যিন্দেগী আর কতদিন? ইঁদুরের মত হাজার বছর বাচার চেয়ে সিংহের মত একদিন বাচা কি উত্তম নয়? আর ঘুম নয়। এবার জেগে ওঠার পালা। এবার দেনা পরিশোধের পালা। এবার রণসাজে সজ্জিত হয়ে ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ময়দানে ঝাপিয়ে পড়ার পালা। এবার মুসলিমদের প্রতিটি রক্তের ফোটার প্রতিশোধ নেবার পালা। এক হাতে নাও কুরআন, আরেক হাতে মেশিনগান। এবার না'রায়ে তাকবীর ধ্বনিতে আসমান-যমিন প্রকম্পিত করার পালা।

فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

قل ما اسئلكم عليه من اجر

وما انا من المتكلفين ৮৬

আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের নিকট এর বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চাচ্ছি না এবং আমি কৃত্রিমতাশ্রয়ীদের অন্তর্ভুক্ত নই

ان هو الا ذكر للعلمين ৮৭

এটা জগদ্বাসীদের জন্য কেবল নসীহত

ولتعلمن نبأه بعد حين ৮৮

আর অচিরেই তোমরা সেটার অবস্থা জানতে পারবে

[سُوْرَةُ صٓ]